প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

বৈশাখ ১৩৫৬

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীঅবনী মোহন পাল চৌধুরী
জাতীয় মুদ্রণ, ৭৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

জ্যোতিষ্ক ও তাহাদের গতি

সূর্য দিনের বেলা পূর্ব দিকে উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যায় — এর চেয়ে বেশি নিশ্চিত সত্য মানুষ কল্পনা করিতে পারে না। জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ লক্ষ্য করে, এই জ্যোতিষ্মান্ পদার্থটি প্রত্যহই ধীরে ধীরে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমন করে। ইহাতে সে মোটেই বিস্ময় প্রকাশ করে না। কিন্তু মেঘমুক্ত অন্ধকার রাত্রিতে নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত না হইয়াছে এরূপ মানুষ বিরল। সন্ধ্যার আকাশে প্রথমেই চোখে পড়ে কতকগুলি বড়ো বড়ো উজ্জ্বল তারা। দুই-একটি বাদে তাহাদের সবগুলিই বেশ ঝিক্‌মিক্ করে। ইহাদের চেয়ে উজ্জ্বলতায় কম, এরূপ অনেক তারাকেও সঙ্গে সঙ্গে মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে দেখা যায়। একটু লক্ষ্য করিলেই চোখে পড়ে, অনেক তারা নানা আকারের লতা কিংবা মালার মতো আকাশে ছড়াইয়া আছে। অনেকগুলি আবার আকাশের গায়ে ছোটো বড়ো নানা রকম ছবি বা মূর্তি আঁকিয়া বিরাজ করে। তারাগুলি রঙবেরঙের। কতকগুলি লাল, কতকগুলি বেশ হলদে, কতকগুলি নীলাভ, কতকগুলি আবার সাদা। বর্ষার শেষে, বিশেষত ভাদ্র আশ্বিন ও কার্তিক মাসে, প্রায় মাথার উপর দিয়া আকাশের উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত ঈষৎ শুভ্র ক্ষীণ আলোকের একটি পথ দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশের মাথায় পথটি দ্বিধাবিভক্ত — মধ্যস্থানটি সম্পূর্ণ কালো। সাধু ভাষায় এই পথের নাম ছায়াপথ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, সুদূরবর্তী অগণিত তারার সমষ্টি লইয়া ইহার সৃষ্টি। একটি বিরাট মাঠে অনেকগুলি গাছ দূরে দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও দূর হইতে দেখিলে মনে হয় গাছগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন সারি সৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে। ছায়াপথকেও এইরূপ একটি

তারার সারি বলা যাইতে পারে। বহু দূরে আছে বলিয়া কোনো-একটি বিশেষ তারার পরিচয় পাওয়া যায় না। সবগুলি একত্রে আমাদের চোখে একটি ম্লান জ্যোতিরেখার অনুভূতি জাগায়। বৎসরের অন্য সময়েও এই ছায়াপথকে দেখা যায়। তখন এই পথ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কমবেশি হেলিয়া পড়ে এবং দ্বিধাবিভক্ত অংশটি মাথার উপর হইতে অনেক দূর সরিয়া যায়, কখনো বা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়।

তারার সৌন্দর্য ছাড়া অন্য প্রকার দৃশ্যও অনেক সময় রাত্রিতে আকাশে চোখে পড়ে। কখনো মনে হয় একটি তারা যেন হঠাৎ আকাশের গায়ে ছুটিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সেটি আবার অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়। এইগুলি উল্কাপিণ্ড। কখনো বা বড়ো একটি উল্কাপিণ্ড হইতে এত উজ্জ্বল আলো নির্গত হয় যে তাহা সমস্ত আকাশকে আলোকিত করিয়া তোলে। পরদিন খবরের কাগজে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। ১৪-১৫ই নভেম্বরের রাত্রি উল্কাপাতের জন্য বিখ্যাত। অপর একটি দৃশ্যও আকাশে কদাচিৎ খালি চোখে দেখা যায়। আকাশের গায়ে ঈষৎ বক্র পুচ্ছ সমেত ধূম্রদেহী ও অনুজ্জ্বল তারকাশোভিতললাট-সম্পন্ন ধূমকেতু দেখিলে সে দৃশ্য কখনো ভোলা যায় না। যাঁহারা ১৯০৯ সালে হ্যালির ধূমকেতু দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহাকে নিশ্চয়ই জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিবেন। গত ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতার আকাশে আর একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়াছিল।

উল্কাপিণ্ড ছাড়া রাত্রির আকাশের জ্যোতিষ্কগুলিকে প্রথমত নিশ্চল মনে হয়। সবগুলিই যেন নিস্তব্ধ আকাশ হইতে মিটমিট করিয়া পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু কিছুক্ষণ রাত্রি জাগিয়া আকাশের দিকে লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, নক্ষত্র-মণ্ডিত সমস্ত আকাশটিকে যেন 'স্লাইডিং ডোরে'র মতন কেহ টানিয়া পূব দিক হইতে পশ্চিম দিকে সরাইয়া লইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ্কগুলিও বৃত্তাকারে পূর্ব হইতে চলিয়া ক্রমশ পশ্চিম

দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। পশ্চিম দিকের আকাশ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ঐ দিকের তারাগুলি ক্রমে ক্রমে সকলেই পশ্চিম দিগন্তে অদৃশ্য হয়। বস্তুত সমুদয় জ্যোতিষ্কই কোনো সময়ে পূর্বাকাশে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যায়। রাত্রিতে নক্ষত্রমণ্ডলের গতি দিনের বেলায় সূর্যের গতিরই অনুরূপ।

কেবল একটি মাত্র তারাকে এই দৈনন্দিন গতি অগ্রাহ্য করিয়া আকাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। উত্তর আকাশের নিম্ন দিকে অবস্থিত অনুজ্জ্বল এই তারাটি ধ্রুবতারা নামে খ্যাত। আকাশে সমুদয় তারাই ইহাকে বৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করে। একটি কমলালেবুর ভিতর একটি দণ্ড চালনা করিয়া এই দণ্ডের চারি দিকে লেবুটিকে ঘুরাইলে লেবুর উপরের সকল অংশই বৃত্তাকারে ঘুরিবে। ঘুরিবে না কেবল উপর ও নীচের বিন্দু দুটি — যাহাদের ভিতর দিয়া দণ্ড গিয়াছে। এইরূপ সমুদয় নক্ষত্র-মণ্ডিত আকাশটিও ধ্রুবতারাগামী একটি কাল্পনিক দণ্ডের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং ধ্রুবতারাটি আকাশে স্থির হইয়া আছে। বস্তুতঃ এই কাল্পনিক দণ্ডটি পৃথিবীর মেরুদণ্ডের দিক নির্দেশ করে। মেরুদণ্ডের চারি দিকে পৃথিবী ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে একবার সম্পূর্ণ ঘুরিয়া আসে। চলন্ত রেল-গাড়িতে বসিয়া আমরা যেমন দেখিতে পাই যে সমুদয় গাছপালা গরুবাছুর, মাঠপথ গাড়ির গতির বিপরীত দিকে ছুটিতেছে, সেইরূপ পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘূর্ণমান পৃথিবী হইতে দেখিয়া আমাদের মনে হয় নভোমণ্ডলের সমুদয় জ্যোতিষ্ক যেন পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বস্তুতপক্ষে জ্যোতিষ্কমণ্ডল প্রতিদিন পূর্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতেছে না, আমাদের পৃথিবীই ইহার বিপরীত গতিতে অর্থাৎ পশ্চিম হইতে পূব দিকে ঘুরিতেছে।

ইহাই সমুদয় আকাশচারী জ্যোতিষ্কের ভ্রমণরহস্য। বাস্তবিক এই জ্যোতিষ্কগুলি কী জাতীয় বস্তু, ইহারা কত দূরেই বা অবস্থিত এবং যে মহাশূন্যে ইহারা বিরাজ করিতেছে তাহাই বা কত বড়,

এ সকল প্রশ্ন অর্থশূন্য নয়। বর্তমান প্রসঙ্গে ইহাই আমরা আলোচনা করিব। কোনো দেশের মানচিত্র আঁকিতে হইলে একটি পরিচিত স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ বিশেষ বস্তু বা স্থানের দূরত্ব নির্দেশপূর্বক একটি নক্‌শা প্রস্তুত করিতে হয়। খগোল-বিবরণ বা মহাশূন্যের জিওগ্রাফি বর্ণনা করিতেও আমাদিগকে সেইরূপ আমাদের পরিচিত পৃথিবী ও সৌরজগৎ হইতে যাত্রা করিয়া আকাশের চতুর্দিকে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীর যন্ত্র

আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবী ছাড়িয়া বাহিরে মহাশূন্যের তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে কয়েকটি শক্তিমান যন্ত্রের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। প্রাচীনেরা এই যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের যদিও কতকগুলি পর্যবেক্ষণ-যন্ত্র ছিল, কিন্তু দূরের বস্তুকে বড়ো ও নিকটে দেখিবার ব্যবস্থা তাঁহাদের জানা ছিল না। কেবলমাত্র চক্ষুর সাহায্যেই চন্দ্র সূর্য ও গ্রহগুলির গতি পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা অনেক তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। ১৬১০ খৃস্টাব্দে ইটালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রথম দূরবীক্ষণ-যন্ত্র বা টেলিস্কোপ নির্মাণ করেন। তিনি শুনিতে পান যে হল্যাণ্ডদেশীয় একজন চশমাবিক্রেতা দুইখানা আতস কাঁচ বা লেন্স পাশাপাশি রাখিয়া লক্ষ্য করিয়াছে যে তাহাদের মধ্য দিয়া দেখিলে দূরের বস্তুকে অনেক বড়ো ও সন্নিকটস্থ বলিয়া মনে হয়। তিনি ঐ দেশ হইতে দুইখানা লেন্স আনাইয়া একটি নলের ভিতর তাহাদের বসাইয়া কিছুকাল পরীক্ষার ফলে একটি ছোটো দূরবীক্ষণ-যন্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। দূরের বস্তু খালি চোখে যত বড়ো দেখায় এই যন্ত্রের সাহায্যে তাহার তিন গুণ বেশি বড়ো দেখাইত। এই বৃদ্ধির অঙ্কটিকে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের বিবর্ধনশক্তি (magnifying power) বলা হয়। উত্তরকালে গ্যালিলিও ৩২-বিবর্ধনশক্তিসম্পন্ন একটি

দূরবীক্ষণ-যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সকল যন্ত্র দ্বারা তিনি বহু উপগ্রহ আবিষ্কার করেন; এবং পৃথিবী সূর্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে, এ কথা প্রকাশ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই মত ধর্মবিরোধী বলিয়া গ্যালিলিওকে তৎকালীন খৃস্টান যাজকদের হস্তে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। গ্যালিলিওর পর গত তিন শত বৎসরের মধ্যে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে হার্শেল নামক এক জার্মান পরিবার নিজের দেশ ছাড়িয়া ইংলণ্ডের বাথ নগরে বসবাস করিত। উইলিঅম হার্শেল ও তাঁহার ভগ্নী কেরোলিন বাথ নগরের গির্জায় গান করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। উইলিঅম হার্শেল কয়েকটি গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুস্তক পড়িয়া অশেষ উৎসাহ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে একটি দূরবীক্ষণ-যন্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হন। তিনি পরে নিজ হস্তে বহু দূরবীক্ষণ-যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ-পর্যবেক্ষণ দ্বারা বহু নক্ষত্র-মণ্ডলের তথ্য আবিষ্কার করিয়া তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। শেষ বয়সে রাজসম্মানে ভূষিত হইয়া তিনি সার্ উইলিঅম হার্শেল নামে খ্যাত হন। হার্শেল-কৃত যন্ত্রগুলি প্রবল বিবর্ধনশক্তির জন্য বিখ্যাত ছিল। তিনিই প্রথম নিউটনের প্রস্তাবানুযায়ী শক্তিসম্পন্ন দর্পণযুক্ত দূরবীক্ষণ-যন্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন।
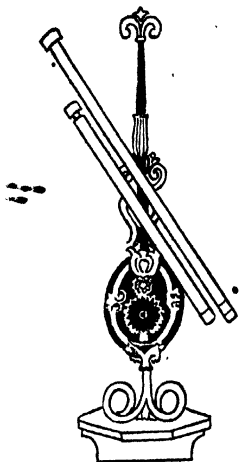
চিত্র ১ — গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ

দূরবর্তী তারা হইতে মোট যে আলো পৃথিবীর দিকে আসে

তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশ পর্যবেক্ষকের নগ্ন চক্ষে পড়ে। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের কাজ শূন্যে অধিক স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত আলোককে একত্রিত করিয়া পর্যবেক্ষকের চক্ষে ফেলা।

এই একত্রীকরণ কাজটি লেন্স কিংবা বক্র দর্পণ (concave mirror) যে-কোনোটির সাহায্যেই হইতে পারে। লেন্স-নির্মিত যন্ত্রকে প্রতিসরণমূলক (refracting) এবং দর্পণ-নির্মিত যন্ত্রকে প্রতিফলনমূলক (reflecting) দূরবীক্ষণ-যন্ত্র বলা হয়। প্রতিসরণ-

চিত্র ২ — লেন্সের পশ্চাতে আলোকরশ্মির প্রতিসরণ দ্বারা গঠিত চিত্র ; ছোটো তীরটি বড়োটির ছবি।
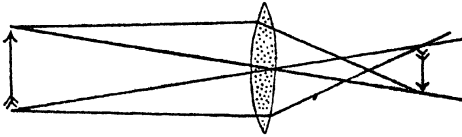
মূলক যন্ত্রে দূরাগত আলোকরশ্মিগুলির যে অংশ লেন্সের উপর পড়ে তাহারা লেন্সের ভিতর প্রবেশ করিয়া সরল পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে (প্রতিসরণ) লেন্সের পিছনে একত্রিত হয়। প্রতিফলনমূলক যন্ত্রে আলোকরশ্মিগুলি দর্পণের গায়ে প্রতিফলিত হইয়া দর্পণের সম্মুখ দিকে একত্রিত হয়। যন্ত্রের বিভিন্ন নামকরণের অর্থ এই। সুস্পষ্ট ছবির জন্য আলোকরশ্মিগুলিকে যথাসম্ভব একত্রিত করা প্রয়োজন, নতুবা ছবি ঝাপসা দেখায়। লেন্সের পৃষ্ঠে যেটুকু আলো পড়ে তাহাই লেন্সের পশ্চাতে একত্রিত হয়। সুতরাং একটি দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সম্মুখের লেন্সের পৃষ্ঠ সেইরূপ অপর একটির চারি গুণ হইলে প্রথমটি দ্বিতীয়টির চার গুণ বেশি আলোক একত্রিত করিতে পারিবে কাজেই দ্বিতীয়টির দ্বারা যে ক্ষীণতম জ্যোতির তারাটি দেখা যাইবে প্রথম লেন্সটি তাহার একচতুর্থাংশ জ্যোতির্বিশিষ্ট তারা দেখাইতে সমর্থ হইবে। এইজন্য দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সম্মুখের লেন্সের ব্যাসের

পরিমাপের উপর ঐ যন্ত্রের আলোকসংগ্রহশক্তি নির্ভর করে। ব্যাস যত বড় হইবে, আলোক সংগ্রহের ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাইবে [১]।

আমেরিকার ইয়ার্কিস মানমন্দিরের প্রতিসরণমূলক দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের আলোকসংগ্রহশক্তি ৪০-ইঞ্চি দ্বারা সূচিত হয়, কারণ তাহার লেন্সের ব্যাস ৪০ ইঞ্চি। এ যুগের বৃহৎ দূরবীক্ষণ-যন্ত্রগুলি কিন্তু প্রতিফলনমূলক। এইরূপ একটি ১০০-ইঞ্চির যন্ত্র আমেরিকায় মাউণ্ট উইলসন পাহাড়ের মানমন্দিরে আছে। ইহার সাহায্যে
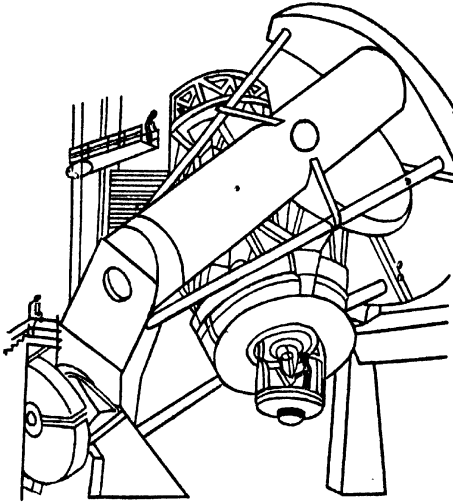
চিত্র ৩ — প্যালোমার পর্বতের ২০০-ইঞ্চি টেলিস্কোপের নক্সা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তিনের পর একুশটি শূন্য বসাইলে যে অঙ্ক হয় তত মাইল দূরের তারার আলোকচিত্র লইতে সমর্থ হইয়াছেন।

১ লেন্সের ব্যাস যদি ২ গুণ বাড়ানো যায় তবে তাহার পৃষ্ঠ (২×২=) ৪ গুণ বাড়িবে, ব্যাস ৩ গুণ বাড়াইলে পৃষ্ঠ (৩×৩=) ৯ গুণ বাড়িবে। এই হিসাবে ব্যাসের সহিত লেন্সের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বাড়িয়া যায়।

সম্প্রতি আমেরিকায় ক্যালিফোর্নিয়ার মাউণ্ট পালোমার-নামক পাহাড়ে ২০০-ইঞ্চির একটি প্রতিফলনমূলক দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে।

খুব বেশি দূরের তারাকে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখা সম্ভব নয়। এইরূপ তারার আলোক এত ক্ষীণ যে যন্ত্রের সাহায্যে একত্রিত হইয়াও মোট আলো এত কম হয় যে তাহা চক্ষুতে প্রবেশ করিয়া দর্শনের অনুভূতি জাগাইতে পারে না। এইরূপ স্থলে আলোকচিত্র (photography) জ্যোতির্বিজ্ঞানীর একমাত্র সহায়। অতি ক্ষীণ আলোকরশ্মিও ফটোগ্রাফের প্লেটের এক বিন্দুতে ক্রমাগত পড়িলে তাহা সে স্থানে কয়েক ঘণ্টায় একটি বিন্দুর ছবি আঁকিয়া দেয়। দূর আকাশের আলোকচিত্র লইতে হইলে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের যে স্থানে আকাশের বস্তুর আলোক একত্রিত হয় সেই স্থানে জ্যোতি-বিজ্ঞানীরা একখানি ফটোগ্রাফের প্লেট রাখিয়া যন্ত্রটির মুখ আকাশের বস্তুটির দিকে ঘুরাইয়া অপর একটি ঘড়িযন্ত্র ছাড়িয়া দেন। ঘড়িযন্ত্রের কলের সাহায্যে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রটি আকাশে নক্ষত্রের গতি অনুসরণ করে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই প্লেটটিতে ঐ দিকের দূরাকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্কের ছবি ফুটিয়া ওঠে। এইরূপ আলোকচিত্রের বিশেষ সুবিধা এই যে দূরাকাশে তারা ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের আপাত ব্যবধান চিত্র হইতে অতি সূক্ষ্মরূপে পরিমাপ করা সম্ভব হয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যন্ত্রের পরিমাপশক্তির কথা শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। নানা প্রকার বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার আবিষ্কারই তাঁহারা কাজে লাগাইয়াছেন। একই আলোকচিত্রে দুইটি জ্যোতিষ্কের ছবি সমান কালো হয় না। দুইটি ছবির কোন্‌টি কত কালো তাহার তুলনা করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশেষ বিশেষ স্থলে জ্যোতিষ্ক দুইটির আপেক্ষিক উজ্জ্বলতাও স্থির করিয়া থাকেন। ফলে এই প্রকারে আমাদের নিকট হইতে জ্যোতিষ্কগুলির দূরত্ব নির্ণয় করাও সম্ভব হয়। এ কথার আলোচনা আমরা পরে করিব।

বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নিকট আলোকবিশ্লেষণ-যন্ত্র একটি অতি

প্রয়োজনীয় জিনিস। কোটি কোটি মাইল দূরের তারায় ও নীহারিকার মধ্যে কি কি পদার্থ লুকাইয়া আছে সে রহস্যও এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। এই যন্ত্রের কাজ বুঝিতে হইলে আলোক এবং তাহার উৎপত্তি ও বিলয় সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন। অধুনা-প্রচলিত বিজ্ঞানের মতানুযায়ী আলোকের প্রকৃতি জটিল। আলোকের দুইটি বিশিষ্ট ধর্ম আছে। পুকুরের জলে এক স্থলে কোনো কারণে সামান্য একটু আলোড়নের উৎপত্তি হইলে তাহা ঢেউয়ের আকারে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। আলোড়িত স্থলে মুহূর্তে যে শক্তি সঞ্চিত হয় তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় এক স্থানে স্তূপাকারে থাকিতে পারে না বলিয়া ঢেউয়ের উৎপত্তি হয়, এবং সেই ঢেউই আলোড়নের শক্তিকে বহন করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ও জার্মান পণ্ডিত হাইন্‌রিখ্‌ হেয়ার্ৎস্‌ পরীক্ষার ও গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে আলোক আকাশে তরঙ্গের মতো চারি দিকে বিস্তৃত
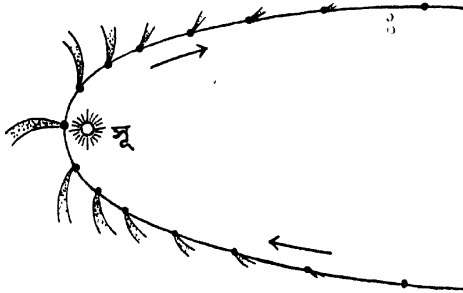
চিত্র ৪ — সূর্যের চতুর্দিকে ধূমকেতুর পথ। পুচ্ছটি সব সময়ই সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে।

হয়। বিজ্ঞানীরা ঈথর-নামে বিশ্বব্যাপী এক অতি সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করেন। তাঁহাদের মতে ঈথর তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের

বাহক। কোনো এক স্থানে প্রথমত তড়িৎকণা বা ইলেক্‌ট্রনের কম্পন দ্বারা তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির সৃষ্টি হয়। এই শক্তি অতি-দ্রুত তরঙ্গাকারে ঈথরের মধ্যে চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, ঠিক যেমন বাহিরের শক্তি দ্বারা সৃষ্ট জলের উপর কোনো আলোড়ন ঢেউয়ের আকারে জলে বিস্তৃত হয়। একটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গে তড়িৎশক্তি ও চুম্বকশক্তি উভয়ই থাকে। কাজেই আলোক ক্ষেত্রবিশেষে তড়িৎধর্মী ও ক্ষেত্রবিশেষে চুম্বকধর্মী বলিয়া প্রকাশ পায়। বস্তুত আলোকে এই দুই শক্তির অস্তিত্ব বহু পরীক্ষার দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কেবলমাত্র আলোকপাত দ্বারা পদার্থের তড়িৎ এবং চুম্বক -ধর্মের পরিবর্তনের পরীক্ষা আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আকাশে যখন প্রবাহিত হয়, তখন আলোক তরঙ্গধর্মী, অর্থাৎ তরঙ্গের সকল ধর্মই আলোকে বিদ্যমান।
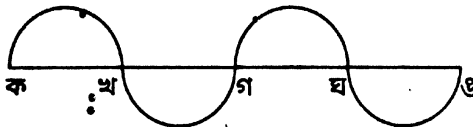
চিত্র ৫ — আলোক-তরঙ্গ।

তরঙ্গের একটি ধর্ম এই যে, ইহাতে নির্দিষ্ট কালের মধ্যে একই প্রকার অবস্থাপরম্পরার পুনরাবৃত্তি হয়। পঞ্চম চিত্রে কখগ একটি সম্পূর্ণ তরঙ্গ। একটি সম্পূর্ণ তরঙ্গে একটি চড়াই ও একটি উৎরাই থাকে। কখগঘ রেখা ধরিয়া তরঙ্গ প্রবাহিত হইলে গঘঙ অংশ কখগ-এরই পুনরাবৃত্তি। কগ এই দূরত্বকে কখগ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বলা হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্যই কোনো নির্দিষ্ট প্রকার আলোকের বৈশিষ্ট্য। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সকল প্রকার আলোকতরঙ্গই শূন্যে একটি নির্দিষ্ট বেগে প্রবাহিত হয়। বস্তুত সকল প্রকার তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গেরই একটি নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে। এই বেগই আলোকের গতিবেগ — প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। রন্‌ৎগেন-রশ্মির

কথা আজকাল সকলে জানেন। ইহার দ্বারা মানুষের হাড়ের আলোকচিত্র লওয়া যায়। চিকিৎসকগণ রোগ-নির্ণয়ের জন্য ইহার বহুল ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই রন্‌ৎগেন-রশ্মিও একটি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, তবে ইহার তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রায় সহস্রভাগের এক ভাগ। অপরপক্ষে বার্তাবহ রেডিওতরঙ্গও তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গবিশেষ, কিন্তু ইহার দৈর্ঘ্য বেশ বড়ো — পনর-কুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া দুই-তিন শত গজ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গও সচরাচর বার্তা বহন করিয়া লইয়া যায়। আমরা যে আলো দেখিতে পাই তাহার এক প্রান্তে বেগনি রঙের আলো, ইহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৩৮০০ অ্যাংস্ট্রম্ (১ অ্যাংস্ট্রম্ = এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ)। আর এক প্রান্তে লাল আলো, ইহার দৈর্ঘ্য ৭৮০০ অ্যাংস্ট্রম্। এই দুইয়ের মাঝামাঝি নীল সবুজ, হলদে, কমলা রঙের আলোকতরঙ্গগুলি আছে। রন্‌ৎগেন-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কয়েক শত অ্যাংস্ট্রম্ পর্যন্ত হয়। আলোর রঙ তাহার তরঙ্গদৈর্ঘ্য দ্বারা সূচিত হয়। মোটের উপর বলা যাইতে পারে কোনো নির্দিষ্ট প্রকার তড়িৎ-চুম্বকীয় আলোকতরঙ্গের পরিচয় তাহার দৈর্ঘ্য হইতেই পাওয়া যায়।

আলোক যখন শূন্যে বিস্তার লাভ করে তখন তাহা তরঙ্গবিশেষ, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। আলোকের উৎপত্তি ও বিলয় পদার্থ দ্বারা হয়। প্রত্যেক পদার্থের মৌলিক উপাদান হইল তাহার পরমাণু। কিন্তু পরমাণু পদার্থের মৌলিক উপাদান হইলেও তাহা তড়িৎকণা বা ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি দ্বারা গঠিত। যথা, হাইড্রোজেনের পরমাণুতে ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা ১, অঙ্গারের পরমাণুতে ৬, নাইট্রোজেনের পরমাণুতে ৭, অক্সিজেনের পরমাণুতে ৮, লৌহের পরমাণুতে ২৬, এবং সর্বাপেক্ষা ভারী মৌলিক পদার্থ ইউরেনিঅমের পরমাণুতে ৯২। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কোনো সংশয় নাই। পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুতেই তাহার বিশিষ্ট অবস্থায় একটি বিশিষ্ট পরিমাণ শক্তি বিদ্যমান থাকে। কোনো বাহ্য কারণে পরমাণু অবস্থানুযায়ী

সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি ধারণ করিতে অসমর্থ হইলে পরমাণুটির শক্তির অবস্থান্তর ঘটে। পরমাণুটি তখন অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি ধারণ করে এবং উদ্বৃত্ত শক্তি পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্যে আলোর তরঙ্গরূপে প্রবাহিত হয়। এই আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্য উপরোক্ত উদ্বৃত্ত শক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট। একটি পদার্থের কোনো পরমাণু কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিমাণের শক্তিধারণে সমর্থ। ইহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারিত পরমাণুতত্ত্বের একটি গুহ্য কথা। সুতরাং পরমাণুটির অবস্থান্তর ঘটিলে কেবলমাত্র কতকগুলি উদ্বৃত্ত শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। ধরা যাক, পরমাণুটি মাত্র
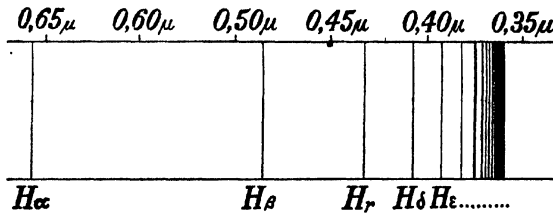
চিত্র ৬ — হাইড্রোজন-গ্যাসের বর্ণচিত্র। বর্ণরেখাগুলি ক্রমশ কাছাকাছি হইয়া এক স্থানে শেষ হইয়াছে।

তিনটি অবস্থায় থাকিতে পারে এবং অবস্থাগুলির শক্তিপরিমাণ ১০০, ৫০ ও ২০। এই পরমাণুর অবস্থান্তরে (১০০ – ৫০ =) ৫০, (১০০ – ২০ =) ৮০, ও (৫০ – ২০ =) ৩০ — মাত্র এই তিনটি উদ্বৃত্ত শক্তি পাওয়া যাইবে এবং পরমাণুটি এই তিন শক্তি অনুযায়ী তিনটি দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারিবে। আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্য যে পদার্থের পরমাণু হইতে তরঙ্গ নির্গত হইয়াছে সেই পদার্থের পরিচায়ক। উপরের উদাহরণে ঐ তিনটি দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গ সেই পদার্থের পরমাণুতেই বিলীন হইতে পারে অর্থাৎ এই পরমাণু ঐ তিনটি দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গ শোষণ করিতে সমর্থ। পরমাণুটি

আলোকতরঙ্গের শক্তি শোষণ করিলে ইহা অধিকতর শক্তিশালী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে পরমাণু যে সকল তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারে তাহাই অবস্থা বিশেষে ঐ সকল তরঙ্গ শোষণ করিতে সমর্থ, ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, পদার্থের পরমাণু দ্বারা আলোকতরঙ্গের উৎপত্তিকালে ও লয়-কালে আলোক মোটেই তরঙ্গধর্মী নহে। তৎকালে ইহা পরমাণুধর্মী। বস্তুত তখন আলোককে তরঙ্গ মনে না করিয়া একটি শক্তিকণা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই শক্তিকণার আংশিক অস্তিত্ব নাই। মাত্র একটি সম্পূর্ণ কণার উৎপত্তি ও লয় হওয়া সম্ভব। তরঙ্গ সম্বন্ধে ঠিক এ কথা বলা চলে না। এই শক্তিকণা-ধর্মের সহিত কোনো একটি পরমাণু দ্বারা কেবলমাত্র কতকগুলি বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের সৃষ্টি ও লয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এইজন্যই কোনো বস্তুর পরমাণু মাত্র কতকগুলি বিশেষ শক্তিসম্পন্ন আলোকের শক্তিকণা শোষণ করিবার ক্ষমতা ধারণ করে।

বহু বৎসর ব্যাপী পরীক্ষার ফলে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণু হইতে কি কি দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাহা বিজ্ঞানীরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঐ সকল তরঙ্গ যে পদার্থ হইতে বাহির হয় কেবলমাত্র তাহার পরমাণুতেই ইহারা বিলীন হইতে পারে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, কোনো দূরাগত আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপ করিতে পারিলেই সেই আলোক কোন্ পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব। বর্ণলিপি-যন্ত্রের সাহায্যে বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী বহু দূরের তারার আলোককে বিভিন্ন তরঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়া ঐ সকল তরঙ্গ কি কি পদার্থের পরমাণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা স্থির করেন।

সূর্যের আলোক এইরূপ যন্ত্রের দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে যে নানা বর্ণের আলোর ছবি পাওয়া যায় তাহাকে সূর্যালোকের বর্ণালী বলা হয়। এইরূপ বর্ণালীর স্থানে স্থানে কতকগুলি কালো রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণালীর প্রত্যেকটি রেখা

সূর্যালোকস্থিত এক-একটি বিশেষ তরঙ্গের পরিচায়ক। আলোকের বর্ণ নির্দেশ করে বলিয়া এই সকল রেখাকে আমরা বর্ণরেখা (spectral line) বলিব। হাইড্রোজেন্-গ্যাসের পরমাণু হইতে উদ্ভূত বহু বর্ণরেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সহিত সূর্যালোকের কতকগুলি বর্ণরেখার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সম্পূর্ণ মিল আছে বলিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে সূর্যে হাইড্রোজেন্-গ্যাস আছে। এইরূপে স্থির করা গিয়াছে যে সূর্যে অক্সিজেন্-গ্যাস এবং সোডিঅম্ ক্যালশিঅম্ ম্যাগ্নেশিঅম্ লৌহ ইত্যাদি নানা প্রকার ধাতুর পরমাণুও আছে। আবার কোনো জ্যোতিষ্কের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া এমন বর্ণরেখাও পাওয়া যাইতে পারে যাহার সহিত পৃথিবীতে পরিচিত কোনো পদার্থের পরমাণুর বর্ণরেখার মিল নাই। বস্তুত ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে পূর্ণগ্রাস-সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যালোকের এরূপ একটি অপরিচিত রেখা দেখা যায়, ইহা হইতে তখন সন্দেহ হয় যে সূর্যে একটি অপরিচিত মৌলিক পদার্থ আছে। সূর্যের গ্রীক নাম 'হেলিওস্' হইতে ঐ মৌলিক পদার্থের নামকরণ হইয়াছিল হিলিঅম্। ইহার সাতাশ বৎসর পরে ইংলণ্ডের পণ্ডিত র‍্যামজে তাঁহার পরীক্ষাগারে বাতাস হইতে হিলিঅম্-গ্যাস সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সুতরাং বলা যাইতে পারে হিলিঅমের আবিষ্কার প্রথম সূর্যেই হইয়াছিল, পৃথিবীতে নহে। অধুনা হিলিঅম্-গ্যাস হাওয়াই-জাহাজে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এখনও বহু জ্যোতিষ্কের আলোকে এরূপ বর্ণরেখা দেখা যায় যাহার পরিচয় পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত মিলে নাই।

বর্ণলিপি-যন্ত্র দ্বারা তারার গতি সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অপর একটি গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। কোনো রেলগাড়ির এঞ্জিন যখন বাঁশি বাজাইয়া স্টেশনের দিকে ছুটিয়া আসে তখন স্টেশনে দাঁড়াইয়া ঐ বাঁশি শুনিলে বাঁশির স্বর তাহার স্বাভাবিক স্বর অপেক্ষা সরু বা চড়া বলিয়া মনে হয়। আবার ঐ এঞ্জিন স্টেশন হইতে দূরে চলিয়া যাইবার সময় বাঁশির স্বর ক্রমশ মোটা হইয়া যায়। ঐ ঘটনার কারণ শব্দের তরঙ্গাকারে বিস্তৃতি। যে-বস্তু হইতে তরঙ্গ সৃষ্টি

হইতেছে তাহা বেগে দর্শকের দিকে অগ্রসর হইলে দর্শকের নিকট সেই তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পাইয়াছে মনে হইবে, পক্ষান্তরে ঐ বস্তু দর্শকের নিকট হইতে দূরে অপসৃত হইবার কালে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইবে। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, যে-বস্তু তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাহা নিশ্চল থাকিলে কোনো-একটি নির্দিষ্ট স্থান ব্যাপিয়া যতগুলি তরঙ্গ থাকিতে পারে বস্তুর অগ্র কিংবা পশ্চাৎ দিকে গতির জন্য যথাক্রমে অল্প কিংবা অধিক সংখ্যক তরঙ্গকে ঠিক সেই স্থানে চাপিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও প্রথম ক্ষেত্রে বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হ্রাস পায়। শব্দতরঙ্গের ক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পাইলে স্বর তীক্ষ্ণতর বা চড়া এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৃদ্ধির সহিত স্বর স্থূলতর বা মোটা হয়। ঠিক এইরূপে কোনো তারা যদি পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসে তবে ঐ তারার আলোকতরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য আমাদের নিকট ছোটো মনে হইবে, অপর-পক্ষে তারার গতি বিপরীত দিকে হইলে তরঙ্গদৈর্ঘ্যও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই ঐ আলোর বর্ণরেখাগুলিকে বর্ণালীতে তাহাদের স্বাভাবিক স্থানে দেখা যাইবে না। তাহারা নিজ স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইবে। এই স্থানান্তরের ব্যবধান অতি অল্প, বিশেষ শক্তিশালী যন্ত্র ব্যতীত ইহা ধরা সম্ভব নহে। এই প্রকার শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। তারার গতি পৃথিবীর বিপরীত দিকে হইলে তাহার বর্ণরেখাগুলি যাবতীয় লোহিত বর্ণের আলোর বর্ণরেখার দিকে স্থানান্তরিত হয়, কারণ লোহিত বর্ণের আলোর তরঙ্গগুলি অন্যান্য রঙের আলোকের তরঙ্গ অপেক্ষা বড়। তারার গতি পৃথিবীর দিকে হইলে তাহার বর্ণরেখাগুলি লোহিতের ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ ভায়লেট বা বেগুনি রঙের দিকে ঈষৎ স্থানান্তরিত হয়। কোনো বর্ণরেখার স্থানান্তরের সূক্ষ্ম পরিমাপ করিয়া তাহার সম্মুখ অর্থাৎ পৃথিবীর বিপরীত, কিংবা পশ্চাৎ অর্থাৎ পৃথিবীর দিকের গতিবেগ গণিতের সাহায্যে স্থির করা যায়। এইরূপে জানা গিয়াছে যে আকাশের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারা লুব্ধক (সিরিঅস্) প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল বেগে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে এবং দক্ষিণ আকাশের অগস্ত্য

(ক্যানোপাস্) -নামে উজ্জ্বল তারাটি সেকেণ্ডে তের মাইল বেগে আমাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। বহু দূরের নীহারিকাপুঞ্জের গতিবেগও এইরূপে তাহাদের আলোর বর্ণরেখার স্থানান্তর পরিমাপ করিয়া নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞানী ডপ্‌লার (Doplar) উপরোক্ত তথ্যটি প্রথম আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহা ডপ্‌লার ফল (Doplar Effect) -নামে পরিচিত।

পৃথিবীর কথা

মহাশূন্যে যাত্রা করিবার পূর্বে আমাদের বাসগৃহ পৃথিবীর কথা কিছু বলা দরকার। মঙ্গল বুধ শুক্র প্রভৃতির ন্যায় পৃথিবীও একটি গ্রহ। গ্রহগুলি সকলেই নিজ নিজ বিভিন্ন প্রায়-বৃত্তাকার পথে সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। গ্রহের পথকে জ্যোতির্বিদ্‌রা কক্ষ বলেন। পৃথিবী যে বর্তুলাকার, প্রাচীন গ্রীক ও পরবর্তী ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌রা তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইরাটোস্থেনিস্ নামে আলেকজান্দ্রিয়ার একজন গ্রীক পণ্ডিত লক্ষ্য করেন যে মিশর হইতে রওনা হইয়া উত্তর দিকে তাঁহার পূর্বপুরুষের মাতৃভূমি গ্রীসদেশে আসিবার কালে ধ্রুবতারাকে ক্রমশ উচ্চাকাশে উঠিতে দেখা যায়। বর্তুলাকার পৃথিবীর উপরিতলের বক্রতাকেই তিনি ইহার কারণ বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমান অনুসারে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তিনি একই দিনে আলেকজান্দ্রিয়া ও তাহার দক্ষিণে অবস্থিত আস্যুয়ান নগরের দুইটি কূপে মধ্যাহ্নসূর্যের রশ্মিপাত পর্যবেক্ষণ করিয়া পৃথিবীর ব্যাসের দৈর্ঘ্য গণনা করেন। সেকালের স্থূল গণনা সত্ত্বেও তাহাতে ভুলের পরিমাণ অতি সামান্যই হইয়াছিল।

বর্তমানে সূক্ষ্ম গণনার দ্বারা পৃথিবীর ব্যাস মোটামুটি আট হাজার মাইল স্থির হইয়াছে। পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থল ঘিরিয়া যে কাল্পনিক বিষুব-রেখা আছে তাহার উপরের একটি বিন্দু প্রায় আট হাজার মাইল

ব্যাসের একটি বৃত্তের উপর প্রত্যেক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে একবার সম্পূর্ণ ঘুরিয়া আসে। এই ঘোরার সময়ই আমাদের এক দিন। পৃথিবীর উপরিভাগ সম্পূর্ণ সমতল না হইলেও তাহার পাহাড় পর্বত উপত্যকা সমন্বিত সমুদয় উচ্চনীচ ভূমি আট হাজার মাইলের তুলনায় নগণ্য।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক দেহকে মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করেন। উপরিভাগ একটি লঘু গ্র্যানাইট্‌শিলা-গঠিত দৃঢ় আবরণ বিশেষ। ইহাকে ভূ-ত্বক বলা হয়। এই ভূ-ত্বক পঞ্চাশ মাইলের বেশি গভীর নয়। পরের কতকগুলি স্তর কঠিন গুরুশিলাময় ও গভীরতায় প্রায় দুই হাজার মাইল। তৃতীয় স্তরটি লৌহ ও নিকেলধাতু -নির্মিত
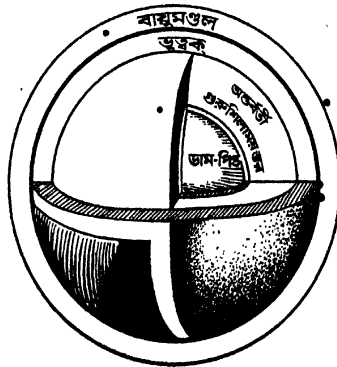
চিত্র ৭ — পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন স্তর

একটি পিণ্ড বিশেষ, এবং ইহা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বর্তুলাকার পিণ্ডটির ব্যাস প্রায় দুই হাজার মাইল। পৃথিবীর তিন স্তরের পদার্থ একত্রে মিশাইলে তাহা জলের প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ ভারী হইবে, কিন্তু ভূ-ত্বক জলের প্রায় আড়াই গুণ মাত্র ভারী।

পৃথিবীর উপরিতলের অধিকাংশ জল দ্বারা আবৃত। এই অংশগুলিই সমুদ্র। অন্যান্য স্তরের তুলনায় এই জলভাগ অতিশয়

অগভীর। সমস্ত পৃথিবী ঘিরিয়া একটি বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সহিত শূন্যে ঘুরিতেছে। এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবীরই অংশ। উর্ধ্বে প্রায় ছয় শত মাইল পর্যন্ত ইহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার উপরিভাগ অতিশয় লঘু। বায়ুমণ্ডলের প্রায় সমুদয় পদার্থই নিম্নের দশ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। মেঘ বৃষ্টি ঝড় বাতাস প্রভৃতি প্রবল আলোড়ন সামান্য কয়েক মাইলের বেশি উর্ধ্বে কখনো পৌঁছায় না।

পৃথিবীর জীবনে এই বায়ুমণ্ডলের লীলা অতি বিচিত্র। প্রথমত এই বায়ুমণ্ডল না থাকিলে জীবের প্রাণধারণ অসম্ভব হইত। পৃথিবীতে দিনের বেলা সূর্যের তাপ তাহা হইলে এত অধিক হইত যে ইহা প্রাণীর বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিত। আবার রাত্রিতে তাপ নামিয়া সকল দেশ মেরুপ্রদেশের মত ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। বস্তুত পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার কারণ ইহার বায়ুমণ্ডল। দ্বিতীয়ত বায়ুমণ্ডলের অভাবে আমাদের এই সুন্দর নীল আকাশ সম্পূর্ণ মসীবর্ণ ধারণ করিত। সাদা সূর্যালোক মোটামুটি বেগনি, ঘন নীল, লঘু নীল, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল এই সাতটি বর্ণে গঠিত। ইহার মধ্যে নীল উপাদানটি ধূলিকণা ও বায়ুকণায় প্রবলভাবে বিচ্ছুরিত হইয়া আকাশের সমুদয় দিক নীলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তোলে। বিপরীত লাল উপাদান কিন্তু বিশেষ বিচ্ছুরিত হয় না। সকালে ও সন্ধ্যায় আকাশের মনোহর বর্ণ, মেঘের উপর বিচিত্র রঙের খেলা— সমস্তই এই বায়ুমণ্ডলে সূর্যালোক বিচ্ছুরণের ফল। বায়ুমণ্ডলের প্রভাব মানুষের দৈনন্দিন জীবন ছাড়াইয়া তাহার আধ্যাত্মিক জীবনেও প্রবেশ করিয়াছে। যে উষার সৌন্দর্য দেখিয়া আদি মানব জগৎকর্তাকে প্রণাম করিয়াছে, যে গোধূলি শ্রান্ত রাখালকে তাহার শান্তিময় গৃহ ও প্রিয়জনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, বায়ুমণ্ডলের অভাবে এই সমুদয় সৌন্দর্যের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইত। বায়ুমণ্ডলের অভাবে সূর্যোদয়ের সঙ্গেসঙ্গে পৃথিবী গভীর অন্ধকার হইতে মুহূর্তে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। এবং সূর্য পশ্চিম দিগন্তে অস্তমিত

হইবামাত্রই পৃথিবী পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইত। অন্য দিকে আবার বায়ু শব্দবহ। বায়ু ব্যতিরেকে সংগীতের অস্তিত্বই থাকিত না। সুতরাং জীবন রক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও মানবসভ্যতার বিকাশে বায়ুমণ্ডলের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়।

আকাশে যে তারাকে মিট্‌মিট্‌ করিতে দেখা যায় তাহাতেও বায়ুমণ্ডলের প্রভাব আছে। বায়ুমণ্ডলের সকল স্তর স্থির হইয়া নাই। উত্তাপের তারতম্যের জন্য বায়ুস্তরের ঘনত্ব ক্রমাগত স্বল্প পরিবর্তিত হইতেছে। সঙ্গেসঙ্গে বায়ুমণ্ডলে তারার আলোর পথেরও ঈষৎ পরিবর্তন চলিতেছে। ফলে এই দাঁড়ায় যে তারার উজ্জ্বলতা এমন কি রঙও প্রতি মুহূর্তে একটু বদলাইয়া যায় এবং চোখে একটা ঝিকিমিকির
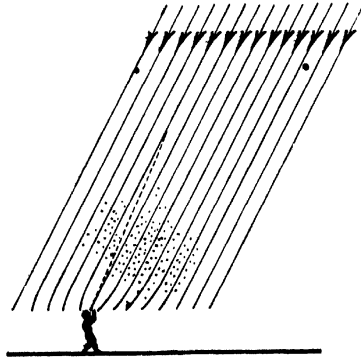
চিত্র ৮— তারার ঝিকিমিকি। বায়ুস্তরে তারার আলোকরশ্মির স্বল্প গতিপরিবর্তন তারার ঝিক্‌মিক্‌ করার একটি কারণ

অনুভূতি জাগাইয়া দেয়। দিগন্তরেখার নিকটে তারা ঝিক্‌মিক্‌ বেশি করে, কারণ তখন তারার আলো তির্যক্‌ভাবে বায়ুমণ্ডলে দীর্ঘতর পথ অতিক্রম করিয়া আমাদের নিকট পৌঁছায় এবং পথের পরিবর্তনও

বেশি ঘটে। অনেকেই সম্ভবত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, গ্রহগুলি তেমন চিক্‌মিক্ করে না। তাহার কারণ, তারাগুলি এত দূরে আছে যে তাহাদের আলো আমাদের নিকট একটি বিন্দু হইতে আসে বলা যায়। গ্রহগুলির আলো গ্রহপৃষ্ঠের সকল বিন্দু হইতেই আসিয়া আমাদের চোখে পড়ে। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে চন্দ্রের ন্যায় গ্রহগুলির কলা কিংবা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠ স্পষ্ট দেখা যায়, কারণ গ্রহগুলি তারার ন্যায় এত দূরে নাই। বহু বিন্দু হইতে যে আলোকরশ্মিগুলি আসে তাহাদের সমবেত পরিবর্তনের ফল মোটামুটি কাটাকাটি হইয়া যায়। সুতরাং গ্রহগুলির আলোক স্থির বলিয়াই মনে হয়। বুধগ্রহ এই নিয়মের বহির্ভূত। এই ক্ষুদ্রতম গ্রহটিকে কেবলমাত্র দিগন্তের অতি নিকটেই দেখা যায়।

আমাদের মাতা বসুন্ধরার বয়স সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহু গবেষণা করিয়াছেন। এই বয়স নির্ণয় করিতে হইলে এমন একটি ঘড়ির আবশ্যক যে-ঘড়ি পৃথিবীর জন্মকাল হইতে এ পর্যন্ত সমানভাবে চলিয়া আসিয়াছে, কখনও তাহার গতির কোনো তারতম্য হয় নাই। এইরূপ একটি গোপন ঘড়ির সন্ধান কিছুকাল পূর্বে বিজ্ঞানীরা পাইয়াছেন। ইউরেনিঅম্-নামক তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ যে সকল খনিজ পদার্থে পাওয়া যায় তাহাতে সেই সঙ্গে সীসাও পাওয়া যায়। এই সীসাকে ইউরেনিঅম্-সীসা বলে। বস্তুত পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে ইউরেনিঅমের পরমাণুগুলিই শক্তিক্ষরণহেতু বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া অবশেষে এই প্রকার সীসার পরমাণুতে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনের হার প্রকৃতি দ্বারা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট। কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরেনিঅমের শতাংশ সীসায় পরিবর্তিত হইতে লাগে প্রায় সাত কোটি বৎসর। থোরিঅম্-নামে অপর একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থও এইরূপে থোরিঅম্-সীসায় পরিবর্তিত হয়। এই দুইটি সীসা সাধারণ সীসা হইতে ঈষৎ ভিন্ন, সুতরাং এই তিন প্রকার সীসাকেই উপযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথক করিয়া ধরা যায়। ইউরেনিঅম্ ও থোরিঅম্ -সম্বলিত কোনো খনিজ পদার্থে যদি ঐ জাতীয় সীসাও পাওয়া

যায় তবে তাহা যে এই দুই তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিবর্তন দ্বারা সৃষ্ট তাহাতে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিজ্ঞানীরা ভূ-ত্বকের বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত ইউরেনিঅম্ ও থোরিঅম্-সম্বলিত শিলাখণ্ডের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন কোন্ শিলার কত অংশ সীসায় পরিবর্তিত হইয়াছে। ফলে ঐ শিলার জন্ম হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে সময়, তাহা সহজেই গণিতের সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। ভূ-ত্বকের প্রাক্-ক্যাম্ব্রিয়ান শিলাস্তর প্রাচীনতম। এই স্তরের শিলা বিশ্লেষণ করিয়া ইহার যে বয়স নির্ণয় করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ ১২৬ কোটি বৎসর। রুশিয়ায় প্রাপ্ত এইরূপ একটি প্রাচীনতম শিলার বয়স গণনা করিয়া পাওয়া গিয়াছে ১৮৬ কোটি বৎসর। মোটামুটি পৃথিবীর প্রাচীনতম কঠিন শিলার বয়স ২০০ কোটি বৎসর ধরা যাইতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কঠিন শিলা গঠিত হইবার পূর্বে পৃথিবী অতি উষ্ণ এক তরল অবস্থায় ছিল। পরে ক্রমশ পৃথিবীর উপরিতল শীতল হইয়া বিভিন্ন শিলাস্তর ও ভূ-ত্বক্ গঠিত হইয়াছে। আদিম তরল অবস্থা হইতে গণনা করিয়া পৃথিবীর বয়স মোটামুটি ৩০০ কোটি বৎসর ধরিলে খুব বেশি ভুল হইবে বলিয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন না।

চন্দ্র

চন্দ্র আকাশে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। নগণ্য গ্রহকণিকার কথা বাদ দিলে চন্দ্র অপেক্ষা আমাদের নিকটতর কোনো গ্রহ-উপগ্রহ আকাশে নাই। আকাশের যাবতীয় বস্তুকে যে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতে দেখা যায় তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র চন্দ্রের ঘূর্ণনটাই সত্য। প্রতিদিনই চন্দ্র যে আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলের গায়ের উপর দিয়া একটু একটু সরিয়া যাইতেছে তাহা লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। চন্দ্র ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে আসিলে অমাবস্যা এবং পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যস্থলে

পড়িলে পূর্ণিমা হয়।/ কিন্তু প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় চন্দ্র সূর্য পৃথিবী এই তিনটি সমরেখায় থাকে না, কারণ চন্দ্রের পথ ও পৃথিবীর পথ একই সমতলে নহে। যখন ইহারা তিনটি পরস্পর সন্নিকট ও প্রায় এক রেখায় থাকে সে তিথি অমাবস্যা হইলে, অর্থাৎ চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যস্থ হইলে সূর্যগ্রহণ, ও পূর্ণিমা হইলে, অর্থাৎ পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যস্থ হইলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। প্রথম ক্ষেত্রে শূন্যে চন্দ্রনিক্ষিপ্ত ছায়াটি পৃথিবীর কোনো অংশের উপর দিয়া যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পৃথিবীনিক্ষিপ্ত বৃহত্তর ছায়াতে চন্দ্র প্রবেশ করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিকট এই সময়দুইটি সংক্ষিপ্ত হইলেও অমূল্য।

এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা আমাদের প্রায় ২৯½ দিন। এই সময়ের মধ্যে চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে সম্পূর্ণ একবার ঘুরিবার পর সূর্য চন্দ্র ও পৃথিবী পুনরায় সমাবস্থায় ফিরিয়া আসে। ইতিমধ্যে চন্দ্রের কলা আমাদের পরিচিতরূপে আকাশে বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস পায়। চন্দ্র বর্তুলাকার বলিয়া চিরকালই তাহার অর্ধেক সূর্যালোকে আলোকিত হয় কিন্তু এই আলোকিত অংশের সম্পূর্ণটা পৃথিবীর দিকে থাকে না। যে অংশটুকু থাকে তাহাই চন্দ্রকলারূপে আমরা দেখিতে পাই। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশে এই চন্দ্রকলা সম্বন্ধে নানা প্রকার সংস্কার প্রচলিত ছিল। ইহাদের মধ্যে একটি অতি অভিনব। চন্দ্রকে মনে করা হইত একটি বাটি, তাহার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে। এই বাটিটি খাড়া হইয়া ঘুরিতেছে। কাজেই ভিতরের আগুনের সাধারণত অংশবিশেষ দেখা যাইবে। এই-অংশবিশেষকেই চন্দ্রকলা মনে করা হইত।

চন্দ্র আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী বলিয়া তাহার সম্বন্ধে বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহু কথা জানেন। দারজিলিং 'অবজারভেটারী হিলে'র উপর হইতে তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা যতটা দূরবর্তী দেখায় মাউণ্টউইলসনের ভীমকায় ১০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা চন্দ্রকে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশিদূর বলিয়া মনে হইবে। পর্যবেক্ষণ ও গণনার সাহায্যে চন্দ্রের দূরত্ব স্থির হইয়াছে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল,

অর্থাৎ তিরিশটি পৃথিবী যদি পরপর গায়ে লাগাইয়া চন্দ্রের দিকে সাজান যায় তবে শেষটি চন্দ্রের গায়ে গিয়া ঠেকিবে। চন্দ্রের দূরত্ব স্থির হইবার পর চন্দ্রের আপাত কৌণিকব্যাস মাপিয়া ইহার প্রকৃত ব্যাস স্থির করা হইয়াছে ২১৬০ মাইল। সুতরাং চন্দ্রের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের এক-চতুর্থাংশের কিছু কম। পৃথিবীর ভিতরটা ফাঁপা হইলে তাহার মধ্যে পঞ্চাশটি চন্দ্র পুরিয়া রাখা চলিত।

চন্দ্রের আলোক মানুষের মনে এক অতি স্নিগ্ধ ভাব আনিয়া দেয়। কিন্তু এই আলোক তাহার নিজস্ব নয়। সূর্যালোক চন্দ্রের গায়ে প্রতিফলিত হয় বলিয়া চন্দ্রকে সাদা দেখায় এবং সেই প্রতিফলিত আলোকই পৃথিবীবাসীর নিকট চন্দ্রালোক। বস্তুত চন্দ্রপৃষ্ঠে যতটুকু সূর্যালোক পড়ে তাহার শতকরা সাতভাগ মাত্র প্রতিফলিত হয়। পৃথিবী হইতে আমরা কিন্তু চন্দ্রের একদিক মাত্রই দেখিতে পাই সেজন্য চন্দ্রপৃষ্ঠের কোনো বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠ দেখিতে কিরূপ তাহা পৃথিবীর লোকের নিকট চিরকাল অজ্ঞাত রহিয়া গেল। ইহার কারণ এই যে, চন্দ্র যে সময়ে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে একবার ঘুরিয়া যায়। অর্থাৎ আমাদের এক চান্দ্রমাস চন্দ্রের এক দিন। ঘরের মধ্যস্থলে একটি প্রদীপ স্থাপন করিয়া এই প্রদীপের দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া কোনো ব্যক্তি যদি ঘর প্রদক্ষিণ করে তবে দেখা যাইবে সম্পূর্ণ একবার প্রদক্ষিণ করার সঙ্গেসঙ্গে সে নিজেও সকল দিকে ক্রমাগত মুখ ফিরাইয়া ঠিক একবার ঘুরিয়াছে। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণকালে চন্দ্রেরও এই অবস্থা হয়। চন্দ্রের পিছনদিক কখনো ঘুরিয়া পৃথিবীর দিকে আসে না সুতরাং পৃথিবী হইতে সেদিক দেখা যায় না। তবে চন্দ্রের জটিল গতির দরুন পৃথিবী হইতে আমরা একুনে চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ দেখিতে পাই।

চন্দ্রকে দেখিতে সুন্দর বলিয়া আমরা উপমাচ্ছলে সুন্দর মুখকে বলি 'চাঁদপানা মুখ'। কিন্তু যাঁহার 'চাঁদপানা মুখ' তাঁহাকে যদি

একবার দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা চাঁদের প্রকৃত মুখখানা দেখান যায়, তবে তিনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন না। খুব ছোট না হইলেও একটু মাঝারি রকম দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্য লইলেই স্পষ্ট দেখা যায় চন্দ্র-পৃষ্ঠে ছোটবড় অসংখ্য বসন্তের দাগের মত গর্ত আছে। গ্যালিলিও তাঁহার তিন-ইঞ্চি যন্ত্রদ্বারা দেখিয়া বলিয়াছিলেন চন্দ্রপৃষ্ঠে ময়ূরপুচ্ছের গায়ে ক্ষুদ্র চক্রের মত বহু চক্র বিদ্যমান। একটি বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে বুঝা যায় চন্দ্রপৃষ্ঠ একেবারে সমতল নহে, বরং বহুপর্বতাকীর্ণ। বৃহৎ পর্বতশ্রেণী, গভীর উপত্যকা ও আগ্নেয়গিরির গহ্বরের ন্যায় গহ্বর তাহাতে আছে। কতকগুলি পর্বতশৃঙ্গের ছায়া কত লম্বা তাহা পরিমাণ করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই শৃঙ্গগুলির উচ্চতাও নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন।* চন্দ্রপৃষ্ঠে ৩০ হাজার ফুট উচ্চ শৃঙ্গও আছে অর্থাৎ গৌরীশঙ্কর হইতেও বেশি উচ্চ। ইহা ব্যতীত কতকগুলি কালো কালো স্থানও সেখানে দেখা যায়। গ্যালিলিও সেগুলিকে সমুদ্র মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুত সেগুলি সমতলক্ষেত্র। বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর বহু বৎসরব্যাপী পরিশ্রমের ফলে চন্দ্রের এক পৃষ্ঠের (অপর পৃষ্ঠ অজ্ঞাত) সুন্দর একটি মানচিত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। এখনও পৃথিবীর উপর এমন অনেক স্থান আছে যেখানে বিজ্ঞানী প্রবেশ করিতে পারেন নাই। সেই সকল স্থানের প্রকৃত মানচিত্র নাই। দৃশ্যমান চন্দ্রপৃষ্ঠ সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। ইহার প্রত্যেক পর্বতশ্রেণী, পর্বতশৃঙ্গ, সমতল ক্ষেত্র, উপত্যকা এমন কি প্রত্যেক প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও নামকরণ হইয়াছে। চন্দ্রের 'আল্পস্' ও 'এপিনাইন' পর্বতশ্রেণী আছে। সেখানকার দুইটি প্রকাণ্ড ঈষৎ সবুজ রঙের প্রান্তরের নাম 'শান্তিসাগর' ও 'রসসাগর' ; একটি ঈষৎ গোলাপি রঙের স্থানের নাম দেওয়া হইয়াছে 'সুপ্তি বিল' (মার্স অব্ স্লিপ) এই প্রকার। অনেকে হয়তো মনে করিবেন 'চন্দ্রাবিষ্ট' না হইলে চন্দ্রের জিওগ্রাফির জন্য কেহ এত ব্যস্ত হয় না।

পৃথিবীর উপরিভাগ ও চন্দ্রের উপরিভাগের বহু পার্থক্য আছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠ সাগর মহাদেশ গিরি বন প্রভৃতি বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ

কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠকে সম্পূর্ণ অনুর্বর ও শিলাময় বলিয়াই মনে হয়। চন্দ্র-পৃষ্ঠের পাহাড়গুলি পার্শ্ববর্তী সমতলক্ষেত্র হইতে সোজা উর্ধ্বদিকে উঠিয়াছে। লম্বা লম্বা ছায়ার সৃষ্টি তাহাতে হয়। পৃথিবীর পর্বতগুলি ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠিয়াছে কাজেই পর্বতের গায়ে কোনো এক স্থানে দাঁড়াইয়া সাধারণত ঐ পর্বতের প্রকৃত উচ্চতা মোটেই বুঝা যায় না। চন্দ্রপৃষ্ঠে যে গর্তের মত স্থান আছে বলা হইয়াছে, সেগুলি বড় অদ্ভুত। দেখিলে মনে হয় সেগুলি যেন সুপ্ত আগ্নেয়-গিরি। বস্তুত তাহাদের সাধারণ গঠন আগ্নেয়গিরির মত নহে। গর্তটা একটা নিম্নভূমি, চারিদিক চক্রাকারে একটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। নিম্নভূমির ব্যাস ১৩০ হইতে ১৪০ মাইল পর্যন্ত দেখা গিয়াছে। এই নিম্নভূমির মধ্যস্থলে একটি কিংবা একাধিক পর্বত নিম্নভূমি হইতে খাড়া উপরদিকে উঠিয়াছে; তাহাদের উচ্চতা কিন্তু প্রাচীরের উচ্চতা অপেক্ষা অনেক কম। এইরূপ ছোটবড় গর্ত চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রায় ত্রিশ হাজার দেখা যায়। বস্তুত পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির গঠন হইতে ইহাদের গঠন বিভিন্ন। ইহাদের পরিচয় লইয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানীমহলে বহু বাদানুবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ মনে করেন ইহারা নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি, চন্দ্রপৃষ্ঠে এক-কালে অগ্ন্যুৎপাতের সাক্ষ্য দিতেছে। প্রতিপক্ষ বলেন, পৃথিবীতে এইরূপ গঠনের আগ্নেয়গিরি কখনও দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন চন্দ্রসৃষ্টিকালে যখন তাহার দেহ কোমল ছিল তখন তাহার অভ্যন্তরে প্রথমত বহু গ্যাসীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং তাহা পরে চন্দ্রপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। যে-যে স্থান দিয়া বাহির হয় সেই-সেই স্থলে এই গর্তগুলির উৎপত্তি হয়। তৃতীয় পক্ষ বলেন, আদিমকালে বড়-বড় উল্কাপিণ্ড চন্দ্রের কোমল গাত্রে পড়িয়া ঐ সকল গর্ত সৃষ্টি করিয়াছে। এই তৃতীয় কল্পনা মোটেই অসম্ভব নয়। পৃথিবীতে পড়িবার কালে বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই প্রায় সমুদয় উল্কাপিণ্ড জ্বলিয়া যায় সুতরাং পৃথিবীপৃষ্ঠে এইপ্রকার গর্তসৃষ্টির সম্ভাবনা কম। চন্দ্রপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডল নাই বলিয়া উল্কাপাতে নানাপ্রকার

অনাবৃষ্টি সম্ভব। সম্প্রতি মাউণ্টউইলসন মানমন্দিরে কয়েকটি পরীক্ষাদ্বারা যে সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সাহায্যে এই সমস্যার মীমাংসা হইবে বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আগ্নেয়গিরি হইতে উদ্ভূত ভস্ম ও ঝামা-পাথরে সূর্যালোক প্রতিফলিত হইলে সেই আলোক যে ধর্মী হয়, চন্দ্রালোকও বহুপরিমাণে সেই ধর্মী। অধিকন্তু এই দুই আলোর তরঙ্গই অনুরূপ সমবর্তিত (polarised)। এই পরীক্ষা হইতে চন্দ্রপৃষ্ঠের গর্তগুলির লুপ্ত আগ্নেয়গিরিগহ্বর হইবারই সম্ভাবনা অধিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই সমস্যার এখনও সম্পূর্ণ মীমাংসা হইয়াছে বলা যায় না।

চন্দ্রপৃষ্ঠে জলের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। কেহ কেহ চন্দ্রপৃষ্ঠে সবুজ রং দেখিয়া তাহা শ্যামল প্রান্তর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু পর্যবেক্ষক ইহার সমর্থন করেন নাই। চন্দ্রপৃষ্ঠের উপরে কোনো বায়ুমণ্ডল নাই। চন্দ্র আকাশে চলিতে চলিতে যখন কোনো তারার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া যায় তখন সে তারাটি অদৃশ্য হইয়া যায়। তারাটি চন্দ্রপৃষ্ঠের ধারে পৌছান পর্যন্ত তাহার উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক থাকে কিন্তু তৎপরমুহূর্তেই তারাটি অদৃশ্য হয়। আবার যখন চন্দ্রপৃষ্ঠের পশ্চাৎদেশ হইতে তারাটি পুনরায় দৃষ্টিপথে পতিত হয় তখন মুহূর্তেই তাহা পূর্ব উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রে বায়ুমণ্ডল থাকিলে প্রথমত তারার জ্যোতি ক্রমশ কমিয়া আসিত, পরে তারাটি চন্দ্রের পশ্চাতে অদৃশ্য হইত এবং অপর পার্শ্ব হইতে নির্গত হইবার কালেও প্রথম কিছুকাল অনুজ্জ্বল দেখাইয়া পরে ইহা স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইত। জল ও বায়ুর অভাবে চন্দ্রে প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং চন্দ্র একটি সম্পূর্ণ মৃত জগৎ—শব্দহীন, গন্ধহীন ও প্রাণহীন উপগ্রহ মাত্র।

শুক্লপক্ষে, বিশেষত পূর্ণিমায়, দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের কতকগুলি গহ্বর হইতে কতকগুলি শাদা রেখাকে গিরিউপত্যকার উপর দিয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইতে দেখা যায়। ইহাদের কোনো ছায়া-

পড়ে না কাজেই তাহারা অনুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী কিংবা ফাটল নয়। এই-গুলি গহ্বর হইতে নির্গত চূর্ণ-শিলা ও ধূলিকণার রেখা হওয়া সম্ভব।

জুল্ ভ্যার্নের কল্পিত পথে একবার হাউইয়ে চড়িয়া চন্দ্রে বেড়াইয়া আসা যাক। ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগে চলিলে ৬০০ ঘণ্টায় অর্থাৎ ২৫ দিনে আমরা চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌঁছিতে পারিব। পৌঁছিয়াই প্রথম আমাদের ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। যখন তখন চারিদিক হইতে উল্কাপাত হইতেছে, মাথা বাঁচানো দায়। চন্দ্রপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডল নাই যে উল্কাগুলি বায়ুতে জ্বলিয়া বিলীন হইয়া যাইবে, সবগুলিই চন্দ্র-পৃষ্ঠে ভীষণবেগে পড়িতেছে, কিন্তু নিঃশব্দে, কারণ বায়ুর অভাবে কোনো শব্দ শোনা যাইবে না। মাটিতে কান রাখিয়া শুইয়া পড়িলে মাটি ও পাথরের ভিতর দিয়া শব্দ শোনা যাইবে। মাথা বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়া গেলে চন্দ্রে বেড়াইয়া অতি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইবে। মনে হইবে শরীরটা খুব হাল্কা হইয়া গিয়াছে। লাফ দিয়া পনর-ষোল ফুট উঁচু প্রাচীর সহজেই পার হইয়া যাওয়া যাইবে। চন্দ্রের ভর কম বলিয়া তাহার আকর্ষণশক্তিও কম, পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির ছয়ভাগের একভাগ মাত্র। চন্দ্রপৃষ্ঠে সবকিছুর ওজনই কমিয়া ছয়ভাগের একভাগ হইবে। কলিকাতার ফুটবল লীগের খেলা যদি একবার চন্দ্রপৃষ্ঠের মাঠে হয় তবে খেলার অধিকাংশই, গ্যালারির পিছন হইতে বিনামূল্যে দেখা যাইবে, যদি না কর্তৃপক্ষ গ্যালারিগুলি কয়েকগুণ উঁচু করিয়া দেন, কেননা খেলোয়াড়রা সামান্য একটু লম্ফ দিলেই ছয়-সাত ফুট শূন্যে উঠিয়া যাইবে এবং বলও অধিকাংশ সময় আকাশেই থাকিবে। 'গোল' হইলে বহু লোক একসঙ্গে করতালি দিয়া চীৎকার করিলেও মাঠে কোনো শব্দ হইবে না। রেফারি লাল নীল সবুজ আলো দ্বারা খেলোয়াড়দের ইঙ্গিত করিবেন, কারণ 'হুইসেল' সেখানে অচল। উপর দিকে একএকবার 'স্যুট' করিলে ফুটবলটি এত উপরে উঠিবে যে তাহাকে ক্রিকেট বল অপেক্ষাও ছোট দেখাইবে। এরূপ মজার খেলা কল্পনা করিতেও আমোদ হয়। চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে আকাশের দিকে তাকাইলে বায়ুর

অভাবে আকাশ একেবারে মসীবর্ণ দেখাইবে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আকাশে দিবারাত্রি তারাগুলি দেখা যাইবে। পৃথিবী হইতে তাহারা যেমন উজ্জ্বল দেখায় চন্দ্রাকাশে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখাইবে। সকল তারার আলো স্থির, মোটেই ঝিকমিক করিবে না। আকাশে সূর্য থাকিলেও আকাশ কালোবর্ণ দেখাইবে। সূর্যালোক চন্দ্রপৃষ্ঠের যে-স্থানে পড়িবে তাহা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে কিন্তু ছায়াগুলিতে গভীর অন্ধকার। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলে আলোক যেমন বিচ্ছুরিত হয় এবং ছায়াও ম্লান আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে, চন্দ্রপৃষ্ঠে তাহার সম্ভাবনা নাই। চন্দ্রাকাশে পৃথিবীকে আমাদের চন্দ্রের প্রায় তের গুণ একটি থালার মত দেখাইবে, কিন্তু ইহা আমাদের চন্দ্র অপেক্ষা বহুগুণে উজ্জ্বল হইবে। মাতা বসুন্ধরা ঈষৎ নীল মেঘের ঘোমটা টানিয়া চন্দ্রাকাশে বিরাজ করিবেন। তাহার গায়ের সমস্ত অংশই আবছায়া, কোনো কিছুর আকারই পরিস্ফুট হইবে না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও মেঘই তাহার কারণ। এই বায়ুমণ্ডল ও মেঘের উপর পতিত সূর্যালোকের শতকরা ৪০ ভাগের বেশি প্রতিফলিত হইবে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর শাদা বরফের ঘেরাটোপ সম্ভবত পরিষ্কার দেখাইবে। বিষুবরেখা অঞ্চলে আবছায়া মেঘমণ্ডল, মরুভূমি অঞ্চলে একটু শাদা রং, মহাদেশগুলি ঈষৎ সবুজ, সমুদ্রগুলি সাধারণত কালো দেখিয়া সম্ভবত চেনা যাইবে। কেবল সমুদ্রের বক্রপৃষ্ঠের যে স্থানে সূর্যালোক প্রতিফলিত হইবে তাহা দর্পণের মত উজ্জ্বল দেখাইবে। চন্দ্রপৃষ্ঠে দিনগুলি বড় দীর্ঘ মনে হইবে। বস্তুত পৃথিবীর ১৪ দিনে চন্দ্রের একদিন; চন্দ্রের এক রাত্রিও তেমনই দীর্ঘ। কারণ, চন্দ্র প্রায় আমাদের চারি সপ্তাহে স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরে। দিনের বেলা সূর্যালোকে চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপ অতি ভীষণ হইবে, প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ফারেন্হিট, অর্থাৎ যে-তাপে পৃথিবীতে জল প্রায় টগবগ করিয়া ফোটে। আবার রাত্রি হইবামাত্র তাপযন্ত্র শূন্যের নীচে ২৬০ ডিগ্রি নামিয়া যাইবে। চন্দ্র যে মৃত জগৎ, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

চন্দ্রের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞানী মহলে বহু জল্পনাকল্পনা আছে। কেহ কেহ বলেন পৃথিবী হইতেই চন্দ্রের জন্ম হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের যে গভীর গর্ত জলপূর্ণ হইয়া বর্তমানে প্রশান্ত মহাসাগর হইয়াছে, সেস্থান হইতে পৃথিবীর আদিম অবস্থায় তাহার এক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্যে চলিয়া যায়। এই বিচ্ছিন্ন অংশ হইতেই চন্দ্রের সৃষ্টি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন চন্দ্রে এককালে পৃথিবীর ন্যায় বায়ুমণ্ডল ছিল, চন্দ্রের আকর্ষণশক্তি কম বলিয়া বায়ুকণাগুলি ক্রমে মহাশূন্যে অন্তর্হিত হইয়াছে। বলবিজ্ঞানের হিসাব অনুসারে চন্দ্রের ভবিষ্যৎ অতি শোকাবহ। এই হিসাব মতে চন্দ্র অতি ধীরে ধীরে পৃথিবী হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। যদিও আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর পৃথিবীর আকাশে চন্দ্রকে এখনকার মতই সুন্দর দেখাইবে তবু অতি সঙ্গোপনে ধীরে ধীরে চন্দ্র পৃথিবী হইতে এত দূরে চলিয়া যাইবে যে একসময়ে আকাশে ইহার থালাটি অতি ছোট হইয়া যাইবে। তাহার পর আবার ক্রমশ ইহার পৃথিবীর দিকে গতি আরম্ভ হইবে। কোটি কোটি বৎসর এই প্রত্যাবর্তন চলিবে। অবশেষে চন্দ্র পৃথিবীর অতি সন্নিকটবর্তী হইয়া সম্ভবত ইহার আকর্ষণবলে শত শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া শূন্যে বিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইবে। চন্দ্রের এই শোচনীয় পরিণামের কথা চিন্তা করিলে সকলেই নিশ্চয় বিষণ্ণ হইবেন, কিন্তু তখন শোক করিবার জন্য কেহ থাকিবে কি?

সৌর জগৎ

সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া যে গ্রহ উপগ্রহ ও গ্রহকণাগোষ্ঠী আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাকে সৌর জগৎ বলে। নামটি অতি উপযুক্ত। এই নাম দ্বারা সূর্যের সন্নিকটবর্তী ক্ষুদ্র জগৎকে তো বুঝায়ই, অধিকন্তু একথাও স্মরণ করাইয়া দেয় যে এই গোষ্ঠীকে সংহত করিবার ভারও সূর্যের উপর। এপর্যন্ত এই গোষ্ঠীতে নয়টি গ্রহের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সূর্য হইতে দূরত্ব অনুসারে তাহাদের নাম যথাক্রমে বুধ

শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস নেপচুন ও প্লুটো। ইহাদের প্রথম ছয়টি খালি চোখে দেখা যায় বলিয়া প্রাচীনেরাও তাহাদের সহিত পরিচিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বুধ ও প্লুটো ক্ষুদ্র, বৃহস্পতি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহার পর শনি ইউরেনাস ও নেপচুন; পৃথিবী ও শুক্র আকারে প্রায় সমান, মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র। প্লুটোকে বাদ দিলে অন্য সবগুলির বিশেষত্ব এই যে ইহাদের প্রায়-বৃত্তাকার কক্ষগুলি প্রায় এক সমতলেই অবস্থিত। নেপচুনের গতিপথকে ৫ ফুট ব্যাসের একটি বৃত্ত মনে করিয়া সব কক্ষগুলির একটি নক্‌সা প্রস্তুত করিলে নক্‌সাটিকে পাঁচফুট চওড়া ও এক ইঞ্চি মাত্র উঁচু একটি বাক্সে পুরিয়া রাখা যায়। কাজেই সমস্ত কক্ষ-গুলি এক-সমতলে অঙ্কিত করিলে অতি সামান্যই ভুল হইবে। প্লুটোর কক্ষ উপরোক্ত নিয়মের বহির্ভূত। ইহা পৃথিবীর কক্ষের সহিত প্রায় ১৭ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত। গ্রহগুলি সূর্যকে একই দিক হইতে ঘিরিয়া প্রদক্ষিণ করে। একই সমতলে অঙ্কিত কক্ষের নক্সা উপর দিক হইতে দেখিলে দক্ষিণাবর্তে প্রদক্ষিণ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

সূর্য হইতে গ্রহগুলির দূরত্ব পরিমাপ করিতে পৃথিবীর দূরত্বকেই একক ধরা হয়। আমরা সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বকে একক অন্তর বলিব। এই দূরত্বের পরিমাণ ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল, চন্দ্রের দূরত্বের প্রায় ২৯০ গুণ। এই হিসাবে সূর্য হইতে প্রথম সাতটি গ্রহের দূরত্ব নির্ণয়ের একটি সুন্দর প্রণালী জর্মান জ্যোতির্বিদ বোডে (Bode) আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। প্রণালীটি এই—প্রত্যেক গ্রহের জন্য ৪ অঙ্কটি ধরা হউক। তাহার পর ইহাদের সহিত যথাক্রমে ০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬, ১৯২,...যোগ করিয়া যোগ ফলকে ১০ দ্বারা ভাগ করিলে সূর্য হইতে পরপর গ্রহগুলির মোটামুটি দূরত্বের অনুপাত পাওয়া যাইবে। যথা—

	বু	শু	পৃ	ম	গ্রহকণিকা	বৃ	শ	ই	নে	প্লু
	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪		
মোটামুটি	০	৩	৬	১২	২৪	৪৮	৯৬	১৯২		
দূরত্ব	০·৪	০·৭	১·০	১·৬	২·৮	৫·২	১০·০	১৯·৬		
প্রকৃত দূরত্ব	০·৩৯	০·৭২	১	১·৫২	২·৮	৫·২৪	৯·৫	১৯·২	৩০	৪০

পৃথিবীর দূরত্ব একক মনে করিলে এই সঙ্কেতটি মোটামুটি প্রথম সাতটি গ্রহের পক্ষে বেশ কাজেরই। এই সঙ্কেতের কোনো গোপন কারণ আছে কি না তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই।

বোডে যখন এই নিয়ম আবিষ্কার করেন তখন মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কোনো গ্রহের অস্তিত্ব জানা ছিল না। বোডের নিয়মানুসারে সূর্য হইতে ২.৮ একক অন্তরে একটি গ্রহ থাকার কথা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই গ্রহ খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারির রাত্রিতে পিয়াৎসি নামে এক ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী আকাশের ঐ প্রত্যাশিত স্থানে এক ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাইলেন। গণনায় বাহির হইল ইহা একটি গ্রহ এবং তাহার ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল; ইহার নামকরণ হইল 'সেরেজ'। ইহার পর 'প্যালাস' 'জুনো' 'ভেস্টা' ইত্যাদি আরও ক্ষুদ্রতর গ্রহ আবিষ্কৃত হইল। ক্ষুদ্র বলিয়া ইহাদিগকে গ্রহকণিকা বলা হয়। ইহারা সকলেই স্বীয় কক্ষে লম্বাকার প্রায়বৃত্তে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। আবিষ্কৃত গ্রহকণিকার সংখ্যা বর্তমানে সহস্রেরও উপর। প্রতিবৎসরই দুই-একটি গ্রহকণিকা আবিষ্কৃত হইতেছে। অতিক্ষুদ্র বলিয়া ইহাদের সঠিক পরিচয় রাখা দুষ্কর। পৃথিবীর নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলেই ইহারা হারাইয়া যায়। অনেক গ্রহকণিকাকে একাধিকবার আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। সূর্য হইতে গ্রহকণিকাগুলির দূরত্বের গড় ২.৮ সুতরাং এই দূরত্ব সম্পূর্ণরূপে বোডের নিয়মানুযায়ী বলা যাইতে পারে।

সৌর জগতের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী গ্রহ প্লুটো ৪০ একক অন্তরে অবস্থিত অর্থাৎ সূর্য হইতে তাহার গড় দূরত্ব ৩৭২ কোটি মাইল। এই সংখ্যাটি সৌর জগতের বহিঃসীমার দূরত্বের একটি পরিচয় দেয়। কিন্তু সৌর জগৎ মহাশূন্যে কিরূপ নিঃসঙ্গ তাহার পরিচয় পাওয়া যায় সৌর জগতের নিকটতম প্রতিবেশীর দূরত্ব হইতে। এই প্রতিবেশী আকাশের একটি তারা; সূর্য হইতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার একক অন্তরে অবস্থিত। এই বিশাল-দূরত্বের কল্পনা আর-এক প্রকারেও করা যাইতে

পারে। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল চলে। সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে প্রায় ৮½ মিনিট লাগে। প্লুটোতে সূর্যের আলোক পৌঁছায় প্রায় ৫½ ঘণ্টায়। আকাশে আমাদের
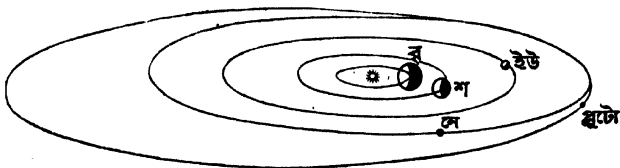
চিত্র ৯ — সৌর জগতের বৃহৎ গ্রহ ও তাহাদের কক্ষ

নিকটতম প্রতিবেশী 'প্রক্সিমা সেণ্টরী' নামের উক্ত তারার আলোক আমাদের নিকট পৌঁছিতে সময় লাগে ৪ বৎসর ৪ মাস।

গ্রহের মধ্যে অনেকগুলির আবার উপগ্রহ আছে। পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ চন্দ্র। বৃহস্পতির ১১টি, শনির ৯টি, এবং ইউরেনাসের ৪টি উপগ্রহ এ পর্যন্ত আবিষ্কার করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত মঙ্গল গ্রহের ২টি এবং নেপচুনের ১টি উপগ্রহ এ যাবৎ দেখা গিয়াছে। বুধ, শুক্র ও প্লুটোর কোনো উপগ্রহ এ পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায় নাই। গ্রহ যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘোরে প্রত্যেকটি উপগ্রহ তেমনি তাহার নিজ গ্রহের চারিদিকে ঘোরে। উপগ্রহগুলির অবয়ব সমান নহে। অধিকাংশ উপগ্রহ ছোট, কয়েকটি আবার বেশ বড়। মঙ্গল গ্রহের 'ফোবোস্' নামে উপগ্রহের ব্যাস মাত্র ১০ মাইল, অন্যদিকে আবার বৃহস্পতির দুইটি উপগ্রহকে বুধ গ্রহের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

সৌর জগতের গ্রহউপগ্রহ ও গ্রহকণিকার সংখ্যা বৃহৎ নক্ষত্র-জগতের নক্ষত্রের সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য। আমরা পরে দেখিব মহাশূন্যে বহু লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রজগৎ বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে যেটিতে আমাদের সূর্য অবস্থিত সেই নক্ষত্রজগতেই প্রায় দশ সহস্র কোটি নক্ষত্র আছে, এইরূপ আনুমানিক হিসাব করা হয়। সুতরাং মহাশূন্যে সমুদয়

সৌর জগৎকেই আমাদের 'বাসগৃহ' বলিলে তাহাকে অমর্যাদা করা হয় বলা চলে না।

সৌর জগতে গ্রহউপগ্রহগুলির পথ আমাদের পরিচিত। অন্য দুই প্রকার আগন্তুককে আমরা সৌর জগতের পথে মাঝে মাঝে চলিতে দেখিতে পাই, যেমন ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড। ইহাদের প্রকৃত রহস্য এখনও সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নাই। ইহারা সকলেই সৌরজগৎবাসী কি না সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কতকগুলি ধূমকেতু সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বলা চলে ইহাদের অবস্থিতি সম্পূর্ণই সৌর জগতে কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সন্দেহ করেন কতকগুলি ধূমকেতু সম্ভবত সৌর জগৎ বহির্ভূত মহাশূন্য হইতে আগত অতিথি। ইহারা একবার সৌর জগৎ পরিদর্শন করিয়া আমাদের বিস্ময় ও ভয় জাগাইয়া চিরতরে
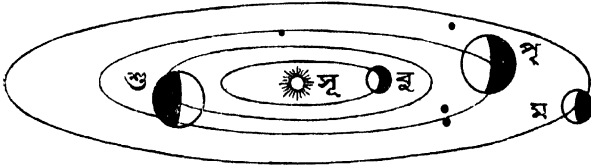
চিত্র ১০ — সৌর জগতের ক্ষুদ্র গ্রহ ও তাহাদের কক্ষ

আবার মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যায়। কতকগুলি ধূমকেতু সম্বন্ধে একথা সম্ভবত সত্য হইলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক্ষণে বিশ্বাস করেন যে অধিকাংশ ধূমকেতুই সৌরজগৎবাসী। উল্কা সাধারণত আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে। তাহাদের পথ পৃথিবীর অতি সন্নিকটবর্তী হইলে পৃথিবীর আকর্ষণে তাহারা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। সেখানে ঘর্ষণ-জনিত উত্তাপের সৃষ্টি হইলে উল্কার পদার্থ গ্যাসীয় আকার ধারণ করে এবং গ্যাসের পরমাণুগুলি শক্তিসম্পন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় গ্যাস হইতে আলোক নির্গত হয়। ভূপতিত অনেক উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, ইহারা লৌহ ও

নিকেল ধাতু সম্বলিত শিলা-বিশেষ। অনেক উল্কার ঝাঁক ধূমকেতুর ন্যায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ধূমকেতুর সহিত উল্কার সম্বন্ধ আছে বলিয়া বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। তাঁহাদের মতে ধূমকেতুর শিরোদেশটি উল্কাদ্বারা গঠিত। সম্ভবত এই শিরোদেশ হইতেই উল্কাখণ্ড কোনো প্রকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া আকাশে দল বাঁধিয়া বিচরণ করিতেছে। কতকগুলি উল্কাপ্রস্তরখণ্ডের তেজস্ক্রিয় উপাদান ইউরেনিয়ম (সীসা) বিশ্লেষণ করিয়া জানা গিয়াছে যে এই সকল উল্কাখণ্ডের বয়স পৃথিবীর ও সৌরগোষ্ঠীর বয়সের অনুরূপ সুতরাং ইহাদিগকে সৌরজগৎবাসী মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু এই বিশ্লেষণে এরূপ 'অতিআধুনিক' উল্কাখণ্ডের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে যাহাদের বয়স দশ কোটি বৎসরের অধিক হইবে না। ইহাদের অনেকগুলি সৌর জগৎ বহির্ভূত মহাশূন্যের অধিবাসী হইতে পারে।

সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে অস্তগত সূর্যের দিক হইতে এক জ্যোতি নির্গত হয়। এই জ্যোতিরেখা কীলকাকার। সরু দিকটি আকাশের দিকে উচ্চে উঠিয়া যায়। সূর্যোদয়ের পূর্বেও এই জ্যোতিরেখাটি বেশ পরিস্ফুট হয়। বিশেষ করিয়া চৈত্রের সন্ধ্যায় ও আশ্বিনের উষায় এই জ্যোতিরেখাটি খুবই স্পষ্ট। ইহাকে রাশিচক্রালোক (Zodiacal light) বলে। বস্তুত আকাশের এই ম্লান জ্যোতিকে শূন্যে পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের পথ বা ক্রান্তিবৃত্ত ধরিয়া চলিতে দেখা যায়। ক্রান্তিবৃত্তটি রাশিচক্রে অবস্থিত। এই রাশিচক্রের আলোক বিশ্লেষণে ধরা পড়িয়াছে যে এই আলোক অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণাদ্বারা বিচ্ছুরিত সূর্যালোক ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ধকার আকাশে আলোকের অর্ধেকের বেশি এই রাশিচক্রালোক। পৃথিবীর বাহিরের শূন্যকে প্রকৃতই 'শূন্য' বা পদার্থহীন মনে করা ঠিক নয়। রাশিচক্রালোকের পরীক্ষা হইতে স্থির করা গিয়াছে যে এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গ্যাসীয় পদার্থ সম্বলিত মেঘখণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে সূর্য অবস্থিত। এই মেঘখণ্ডটি একটি লেন্সের আকারে সূর্য হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়া শূন্যে বিস্তৃত হইয়া আছে। সৌর জগতে একদিকে যেমন কঠিন শিলাময় গ্রহ-

উপগ্রহ ও উল্কাপিণ্ড দেখা যায়, অন্যদিকে আবার রহস্যময় ধূমকেতু এবং অতিসূক্ষ্ম বায়বীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত অতিকায় মেঘখণ্ডের অস্তিত্বের পরিচয়ও ইহাতে পাওয়া যায়।

গ্রহ ও উপগ্রহ

বিভিন্ন গ্রহের কথা সৌরজগৎবাসীর নিকট নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক মনে হইবে না। এই গ্রহগুলি মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীর বাসের উপযুক্ত কি না এবিষয়ে আমাদের কৌতূহল খুব স্বাভাবিক।

পূর্বে বলা হইয়াছে বুধ সূর্যের নিকটতম গ্রহ, সূর্য হইতে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। এই দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে না, কারণ বুধের কক্ষ একটু লম্বামত উপবৃত্ত ; প্রকৃতপক্ষে বুধ সূর্য হইতে ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ হইতে ২ কোটি ৮৬ লক্ষ মাইলের মধ্যে থাকে। সূর্যের নিকটবর্তী বলিয়া ইহাকে কখনও সূর্য হইতে বেশি দূরে দেখা যায় না। সূর্যাস্তের পর কিছুক্ষণ এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে কিছুক্ষণ মাত্র বুধ গ্রহকে দেখা যাইতে পারে, তাও বৎসরের সকল সময় নয়। প্রাচীন গ্রীকেরা সকাল ও সন্ধ্যার আকাশের বুধকে দুইটি বিভিন্ন গ্রহ মনে করিয়া ইহাদের নাম দিয়াছিলেন এপলো ও মার্কারি।

বুধগ্রহ গ্রহগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম। ইহার ব্যাস মাত্র ২১০০ মাইল সুতরাং চন্দ্রের সঙ্গে ইহার তুলনা করা চলে। সূর্যের নিকটতম গ্রহ বলিয়া ইহার গতিবেগ অত্যন্ত বেশি। প্রতি সেকেণ্ডে গড়ে ২৯ মাইল চলিয়া একটি উপবৃত্তাকার পথে বুধ ৮৮ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে সুতরাং আমাদের ৮৮ দিন বুধের এক বৎসর।

দূরবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা দেখিলে চন্দ্রের ন্যায় বুধগ্রহেরও কলা দেখা যায়। বস্তুত যে সকল গ্রহের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের মধ্যে অবস্থিত, যেমন বুধ ও শুক্র, তাহাদের উজ্জ্বল অংশ কলায় হ্রাসবৃদ্ধি পায়। সূর্যের পশ্চাদ্দিকে, ঠিক পশ্চাতে নয়, উপস্থিত হইলে বুধগ্রহের পূর্ণাবস্থা। পৃথিবীর গ্রহের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বুধকে কখনো কখনো সূর্যের ঠিক সম্মুখ

দিয়া চলিতে দেখা যায় তখন মনে হয় যেন একটি কালো বিন্দু সূর্য-পৃষ্ঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। এক শতাব্দীতে প্রায় তের বার এই দৃশ্য দেখা যায় — পর পর এইরূপ দুইটি দৃশ্য সাড়ে তিন বৎসর হইতে তের বৎসরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

বুধের এক দিনে আমাদের কত সময়, অর্থাৎ মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরিতে বুধের কত সময় লাগে, তাহা এখনও নিশ্চিত জানা যায় নাই। তবে খুব সম্ভব, বুধের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘোরা এবং সূর্য প্রদক্ষিণ করা একসময়ের অর্থাৎ ৮৮ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। আমরা দেখিয়াছি চন্দ্রের আবর্তন-গতিও এইরূপ। ইহার ফল এই যে গ্রহের এক পৃষ্ঠই চিরকাল সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে, অপর পৃষ্ঠে চিররাত্রি, তাহাতে কখনও সূর্যালোক পড়ে না। দূরে অবস্থিত বস্তুর তাপের পরিমাপ করিবার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'থার্মোকাপ্‌ল্' নামে এক অতি সূক্ষ্ম তাপমানযন্ত্র ব্যবহার করেন। এই তাপমানযন্ত্র বুধের অন্ধকার পৃষ্ঠের দিকে রাখিয়া যন্ত্রের কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। এই পৃষ্ঠ নিশ্চয়ই অত্যধিক শীতল এবং সম্ভবত চিরকালই সূর্যের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে। অপর পৃষ্ঠ সূর্যতাপে পুড়িয়া ৬৫০ ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে বলিয়া যন্ত্রে বোঝা যায়।

বুধপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্বের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কারণেও বুধপৃষ্ঠ অত্যধিক গরম। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আমাদের অত্যধিক সূর্যতাপ হইতে রক্ষা করে। চন্দ্র ও বুধের বায়ুমণ্ডলের অভাবের কারণ একই। ইহাদের ভর কম হওয়াতে জড় আকর্ষণও কম — এত কম যে ইহারা বায়ুকণাগুলিকে ধরিয়া রাখিতে অসমর্থ, সুতরাং বায়ুর কণাগুলি ক্রমে মহাশূন্যে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

শুক্র

বুধের পরের গ্রহটি শুক্র। সূর্য হইতে ইহার দূরত্ব পৃথিবী হইতে

সূর্যের দূরত্বের দুই-তৃতীয়াংশ। শুক্রগ্রহই পশ্চিম সন্ধ্যাকাশে সন্ধ্যাতারা এবং শেষরাত্রির পূর্ব আকাশে শুকতারা নামে পরিচিত। ইহা সময় সময় এত উজ্জ্বল হয় যে কেবল ইহার আলোতেই ক্ষীণ ছায়া পড়ে। শুক্রকে পৃথিবীর 'জুড়িদার' গ্রহ বলা যাইতে পারে। আকারে ইহা পৃথিবী হইতে সামান্য ছোট এবং দূরত্ব হিসাবে পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। চন্দ্র ও বুধের ন্যায় ইহারও কলা দেখা যায়। ইহা যখন পৃথিবীর খুব নিকট তখন দূরবীক্ষণযন্ত্রে ইহাকে তৃতীয়া ও চতুর্থীর চন্দ্রের মত দেখায়। উজ্জ্বলতম অবস্থায় দেখিতে ইহা প্রায় পঞ্চমীর চন্দ্রের ন্যায়। পূর্ণ অবস্থায় ইহা পৃথিবী হইতে সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে সুতরাং দূরও বেশি এবং উজ্জ্বলও কম।

শুক্র গ্রহের একবার সূর্যপ্রদক্ষিণ করিতে ২২৫ দিন লাগে। কিন্তু এই গ্রহটি কোন্ সময়ে স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে একবার ঘুরিয়া আসে এ-সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত মীমাংসা এ-পর্যন্ত হয় নাই। খুব সম্ভব এই সময় ৩০ দিনের কাছাকাছি হইবে। কারো কারো মতে শুক্র ২২৫ দিনে যেমন একবার সূর্যপ্রদক্ষিণ করে তেমনি সেই সময়েই স্বীয় অক্ষের চতুর্দিকে একবার ঘোরে। ইহা সত্য হইলে শুক্রের একপৃষ্ঠ চিরকাল অন্ধকারে আবৃত থাকিবে। কিন্তু 'থার্মোকাপ্‌ল্' নামক তাপ-মানযন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া ইহার কোনো সমর্থন পাওয়া যায় নাই।

বুধের ন্যায় শুক্রকেও কোনো কোনো সময় সূর্যপৃষ্ঠের উপর দিয়া যাইতে দেখা যায়। এই অতিক্রমণ কালটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিকট অতি মূল্যবান। পৃথিবীর দুই স্থান হইতে এই অতিক্রমণ কাল পর্যবেক্ষণ করিয়া সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব অর্থাৎ 'একক অন্তর' গণনা করা হইয়া থাকে কিন্তু এই ঘটনাটি সচরাচর ঘটে না। পর পর ১১৩½ এবং ১২৯½ বৎসর অন্তর একবার শুক্রগ্রহের সূর্যপৃষ্ঠ অতিক্রমণ ঘটে। অতিক্রমণটি কিন্তু 'জোড়ে' হয় অর্থাৎ একবার ঘটিলে ৮ বৎসর পর পুনরায় ঘটে এবং তৎপর ১১৩½ কিংবা ১২৯½ বৎসরের মধ্যে আর ঘটে না। বর্তমান সময়ের পরবর্তী অতিক্রমণকাল ২০০৪ খৃস্টাব্দের ৮ই জুন এবং ২০১২ খৃস্টাব্দের ৬ই জুন।

পৃথিবী ও শুক্রের অপর একটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয়েরই একটি বায়ুমণ্ডল আছে যদিও শুক্রের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল হইতে ভিন্ন প্রকারের। শুক্রের উজ্জ্বলতার কারণ এই যে গ্রহটি সম্পূর্ণরূপে মেঘমণ্ডলে ঢাকা। মাটি পাথর অপেক্ষা সূর্যরশ্মি মেঘের উপর হইতে অনেক বেশি পরিমাণে প্রতিফলিত হয়। মেঘের উপর সূর্যালোক পড়িলে পাহাড়ের উপর হইতে ঐ মেঘকে অত্যধিক উজ্জ্বল দেখায়, ইহা দারজিলিঙ্ পাহাড়ে চড়িয়া অনেকে হয়তো লক্ষ্য করিয়াছেন। সূর্যালোক শুক্রগ্রহের মেঘাবরণে প্রতিফলিত হওয়ার জন্যই আমরা ইহাকে এত উজ্জ্বল দেখি। প্রকৃতপক্ষে শুক্রপৃষ্ঠ কিরূপ তাহার কোনো পরিচয় পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ শুক্রাকাশ কখনও মেঘমুক্ত হয় না। অনেক পর্যবেক্ষক সময় সময় এই মেঘমণ্ডলে কালো দাগ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন কিন্তু ঐ দাগগুলি স্থায়ী না হওয়াতে ইহাদের রহস্য এখনও অনাবৃত রহিয়া গিয়াছে।

শুক্রপৃষ্ঠের আবহাওয়াতে মানুষের ন্যায় জীবের বাস একেবারে অসম্ভব মনে হয় না। মঙ্গলগ্রহে জীবের অস্তিত্ব কোনো কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন কিন্তু মোটের উপর শুক্র মঙ্গল অপেক্ষা জীবের বাসের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। সূর্যের নিকটবর্তী বলিয়া শুক্র-পৃষ্ঠের পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ উত্তপ্ত হওয়ার কথা, কিন্তু শুক্রের মেঘাবরণ নিশ্চয়ই তাহাকে অত্যধিক উত্তাপ হইতে রক্ষা করে। শুক্রপৃষ্ঠের বিষুবরেখার অঞ্চল কিছু বেশি উত্তপ্ত হইলেও তাহার মেরুদেশগুলিতে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া হওয়ারই কথা। সুতরাং মেরুদেশগুলি উদ্ভিদ ও জীবের বাসের উপযোগী হইতে আপত্তি নাই। কিন্তু সম্প্রতি মাউণ্টউইলসন মানমন্দিরে কতকগুলি পরীক্ষার ফলে শুক্রপৃষ্ঠে জীবের বাস অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হয়। আলোকবিশ্লেষণদ্বারা শুক্রাকাশের মেঘাবরণের উপরিদেশে অক্সিজান গ্যাসের অস্তিত্ব মোটেই পাওয়া যায় নাই বরং তথায় প্রচুর পরিমাণে কারবন-ডাইঅক্সাইড আছে বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। অক্সিজান ব্যতীত জীবের প্রাণধারণ অসম্ভব, অপর পক্ষে অধিক পরিমাণ কারবন-

ডাইঅক্সাইড জীবের বাসের অনুপযোগী। এই কারবন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস খুব ভারী সুতরাং ইহা মেঘের উপর হইতে শুক্রপৃষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। অধিকন্তু আমরা জানি যে, সমুদয় উদ্ভিদ কারবন-ডাইঅক্সাইডকে অক্সিজান গ্যাসে পরিবর্তিত করে। শুক্রাকাশে এই অক্সিজান গ্যাসের অভাবহেতু মনে হয় কোনো উদ্ভিদও সম্ভবত শুক্রপৃষ্ঠে নাই। উদ্ভিদজগৎ ব্যতিরেকে প্রাণীজগতের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু মেঘাবরণের নীচে শুক্রপৃষ্ঠের অতি-নিকট-বায়ুমণ্ডলে কি কি গ্যাস আছে তাহার পর্যবেক্ষণের সুবিধা না থাকাতে উপরের অনুমানগুলি ভ্রান্তও হইতে পারে। সুতরাং শুক্রগ্রহে উদ্ভিদ ও জীবের অস্তিত্ব একেবারে অসম্ভব, একথা এখনও জোর করিয়া বলা চলে না।

কেহ কেহ মনে করেন শুক্রের মেঘাবরণের অস্থায়ী কালো দাগগুলি প্রকৃতপক্ষে শুক্রপৃষ্ঠের অংশবিশেষ। কোনো কারণে মেঘাবরণ ঈষদুন্মুক্ত হওয়াতে তাহার ভিতর দিয়া ক্ষণেকের জন্য শুক্রপৃষ্ঠের প্রকৃত রূপ দেখা যায়। একথা সত্য হইলে শুক্রে যদি মানুষ থাকে তাহাদের নিকট জগৎ কি রহস্যময়! দৈনন্দিন জীবনে আকাশ চিরকাল ঘন-মেঘে ঢাকা। তাহাদের 'দিন'গুলি সম্ভবত আমাদের এক এক মাসের সমান লম্বা, মোটের উপর বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু দৈবাৎ একদিন রাত্রিতে আকাশের কোনো অংশ মেঘমুক্ত হইলে শুক্রের জীব বিস্মিতনেত্রে বিচিত্র নক্ষত্রমণ্ডিত নভোমণ্ডল দেখিয়া নিশ্চয়ই মোহিত হয়। প্রবলপ্রতাপান্বিত সহস্রাংশু সম্ভবত তাহাদের নিকট দেবতারূপে আবির্ভূত হন। ক্ষণকালের জন্য বিশ্বের প্রকৃতরূপ এইরূপে শুক্রবাসীর নয়নগোচর হইয়া পুনর্বার মেঘের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়। শুক্রগৃহে জ্যোতির্বিজ্ঞান অসম্ভব কিন্তু পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই ক্ষণেকের অপূর্ব অনুভূতির জন্য নিশ্চয়ই শুক্রগৃহে ভ্রমণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

মঙ্গল

শুক্রের পর পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহ সৌর জগতের তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রহ। মঙ্গলগ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট— ইহার ব্যাস প্রায় ৪২০০ মাইল। কিন্তু পৃথিবীর সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহার উপরিতলের শৈত্য ও উত্তাপ পৃথিবী হইতে বিভিন্ন হইলেও পৃথিবীর জলবায়ুর সহিত ইহার জলবায়ুর মোটামুটি তুলনা করা চলে। ঠিক পৃথিবীর ন্যায়ই মঙ্গলগ্রহের মেরুদণ্ডও তাহার কক্ষের লম্বের সহিত ২৩½ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত। সুতরাং এই গ্রহে ঋতুপরিবর্তন অনেকটা পৃথিবীর অনুরূপ। মঙ্গলগ্রহ তাহার মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে আমাদের ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে একবার ঘোরে। অর্থাৎ আমাদের দিন ও মঙ্গলগ্রহের দিন প্রায় সমান। সূর্য প্রদক্ষিণ করিতে কিন্তু মঙ্গলগ্রহের ৬৮৭ দিন লাগে অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহের এক বৎসর আমাদের প্রায় ২৩ মাস।

মঙ্গলগ্রহের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের বাহিরে বলিয়া ঐ গ্রহের যে অর্ধে সূর্যালোক পড়ে তাহার প্রায় সকল অংশই পৃথিবী হইতে দেখা যায়। বস্তুত দূরবীক্ষণযন্ত্রে মঙ্গলগ্রহের যে অংশ আলোকিত দেখা যায় তাহা শুক্লপক্ষের দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীর চন্দ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র নয়। মঙ্গল-গ্রহ সূর্য হইতে ১½ একক অন্তরে অবস্থিত, সেইজন্য গ্রহটি যখন পৃথিবীর নিকটতম হয় তখন পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের মাত্র অর্ধেক। এই অবস্থায় মঙ্গলগ্রহকে অতিশয় উজ্জ্বল দেখায়। অপরপক্ষে গ্রহটির পৃথিবী হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক দূরত্ব ২½ একক। তখন ইহার উজ্জ্বলতা পূর্বাবস্থার পঁচিশ ভাগের একভাগ মাত্র। গ্রহটি পৃথিবীর যখন নিকটতম হয় তখন ইহাদের পরস্পরদূরত্ব কিন্তু প্রতিবারেই সমান হয় না। ১৫ কি ১৭ বৎসর পর পর গ্রহদুইটির পরস্পরদূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম হয়। তখন মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণের সর্বোৎকৃষ্ট সময়।

পৃথিবীর সহিত মঙ্গলগ্রহের আরও একটি সাদৃশ্য এই যে উভয়েরই

একটি বায়ুমণ্ডল আছে। বায়ুমণ্ডলের জন্য পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গল-গ্রহেও সকাল ও সন্ধ্যায় গোধূলির সৃষ্টি হয়। দূরবীক্ষণযন্ত্রে মঙ্গল-পৃষ্ঠের পূর্ণ আলোকিত অংশের পরও একটি ক্ষুদ্র স্বল্পালোকিত অংশ দেখা যায়। এই ক্ষীণ আলোক ঐ গ্রহের বায়ুমণ্ডলে সূর্যালোক বিচ্ছুরণের ফলে সৃষ্ট হয়। এত সাদৃশ্য সত্ত্বেও পৃথিবীর সহিত ইহার একটি বিশেষ বিভিন্নতা আছে। মঙ্গলপৃষ্ঠে কোনো পর্বত মালভূমি এমন কি সামান্য উচ্চনীচ ভূমিরও অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না। সমুদয় মঙ্গলপৃষ্ঠকেই একটি বিশাল সমতল ক্ষেত্র বলিয়া মনে হয়। স্থানে স্থানে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বর্ণ দেখা যায় এমন কি মঙ্গলপৃষ্ঠে বহু সরলরেখার অস্তিত্বও দূরবীক্ষণযন্ত্রে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন।

মঙ্গলগ্রহে মানুষের বাস আছে কি না ইহা লইয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহু বিতর্ক আছে। এই তর্কের ইতিহাসটি বেশ মজার। সিয়াপারেলি নামে এক বিখ্যাত ইতালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে দূরবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা মঙ্গলপৃষ্ঠে কতকগুলি সরলরেখার ন্যায় দাগ দেখিতে পান। ইতালীয় ভাষায় তিনি ইহাদের বলেন 'কানালী' (canali), অর্থাৎ নালীর ন্যায় পথ। ইংরেজী ভাষায় ইহার তর্জমা করা হয় 'canals' অথবা কৃত্রিম খাল। সেই অবধি সর্বসাধারণের নিকট এই দাগগুলি মঙ্গলের 'খাল' নামেই পরিচিত। আমেরিকার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী পিকারিং এই দাগগুলির পার্শ্বে স্থানে স্থানে সবুজ রং দেখিয়া মনে করেন যে এই খালগুলি জলপূর্ণ এবং ইহাদের দুই পার্শ্বে কোনো কোনো স্থলে প্রচুর উদ্ভিদ আছে। আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী পার্সিভাল লাওয়েল (Percival Lowell) এই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য ১৮৯৪ সালে আরিজোনা প্রদেশের ফ্ল্যাগস্টাফ নামক স্থানে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সমুদয় অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা মঙ্গলগ্রহের পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত করেন। তিনি বহু পর্যবেক্ষণ দ্বারা মঙ্গলপৃষ্ঠের একটি মানচিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মঙ্গলগ্রহে সরলরেখার আকারে বহু 'খাল' আছে। এই গ্রহের উত্তর ও দক্ষিণ

মেরুদেশ সাদা বরফে ঢাকা। খালগুলির অনেকগুলি মেরুদেশের সহিত সংযুক্ত। জ্যামিতিক রেখার ন্যায় খালগুলি এইরূপ শৃঙ্খলার সহিত মঙ্গলপৃষ্ঠে সজ্জিত যে এইগুলি নিশ্চিত কৃত্রিম। এই আনুমানিক খাল ছাড়া মঙ্গলগ্রহের সমুদয় পৃষ্ঠ সমতল বলিয়া মনে হয়। লাওয়েল মনে করেন বৈচিত্র্যহীন মঙ্গলপৃষ্ঠের সমতলক্ষেত্রগুলি মরুভূমি। এই মরুভূমির মধ্য দিয়া খালগুলি কাটা হইয়াছে। কোনে কোনো সবুজ স্থানে চারিদিক হইতে বহু খাল সরলরেখায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। লাওয়েল এই স্থানগুলিকে বলেন ওয়েসিস্ বা মরূদ্যান। মঙ্গলগ্রহে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে মরুদেশের তুষার গলিয়া খালগুলি সম্ভবত জলপূর্ণ হইয়া উঠে তখন তাহাদের দুইপার্শ্বের সমুদয় স্থান উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়া সবুজরঙে রঞ্জিত হইয়া উঠে। শীতের পূর্বে সেইসব স্থানে পুনরায় বাদামি রং দেখা যায়; পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশে শীতের পূর্বে গাছের পাতা ঝরিয়া সমুদয় প্রকৃতির রূপও ঠিক এই প্রকার হয়। লাওয়েলের মতে খালগুলি নিশ্চয়ই কোনো বুদ্ধিমান জীবের কাজ। তাহারা এই উপায়ে একটি মরুময় জগৎ কৃষিকর্মের উপযোগী করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুত মঙ্গলপৃষ্ঠের এই সুবিশাল এন্‌জিনিয়ারিং কাজ নিশ্চয়ই মানুষ-জাতীয় জীবের কীর্তি বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু বহু খ্যাতিমান্ জ্যোতির্বিজ্ঞানী দূরবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা মঙ্গলপৃষ্ঠে কোনো কালো দাগ দেখিতে না পাইয়া লাওয়েল-কল্পিত খালের সমুদয় কথা অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে উপহাসও করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে মঙ্গল-পৃষ্ঠের আলোকচিত্র লইয়া 'খাল' নামে পরিচিত কতকগুলি বড়ো কালো দাগের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু এই কালো-রেখাগুলির জ্যামিতিক শৃঙ্খলা মোটের উপর আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। কিন্তু লাওয়েলের কল্পনার মূল কথা অর্থাৎ কালো রেখা (কল্পিত খাল)গুলি প্রকৃতই কৃত্রিম কি না তাহার সত্যাসত্য সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না।

কিন্তু মঙ্গলগ্রহে মনুষ্যের বাস সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানীমহলে একটা বড় অবিশ্বাসই দেখা যায়। প্রথমত মঙ্গলপৃষ্ঠে উত্তাপের তারতম্য

অত্যধিক। ইহার বিষুবরেখা অঞ্চলে দিনের উত্তাপ প্রায় ৫০ ডিগ্রি, কিন্তু রাত্রিতে এইসকল স্থানেই তাপমানযন্ত্র শূন্যের নীচে ১২৫ ডিগ্রি নামিয়া যায়। এইরূপ আবহাওয়ায় আমাদের মত জীবের বাস অতি দুরূহ। মঙ্গলপৃষ্ঠে জলের পরিমাণ অতি অল্প বলিয়াই মনে হয়। মেরুঅঞ্চলের বরফ খুব সম্ভব মাত্র কয়েক ইঞ্চি গভীর এমন কি ইহা কেবলমাত্র জমাট শিশিরও হইতে পারে। মঙ্গলপৃষ্ঠের অপর অংশে জলের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না সুতরাং 'খাল'গুলির জলপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা অতি কম। মঙ্গলগ্রহে জীবের বাস সম্বন্ধে অবিশ্বাসের প্রধান যুক্তি এই যে, সম্প্রতি মঙ্গলাকাশের বায়ুমণ্ডলের বিচ্ছুরিত আলোক বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া গিয়াছে যে ঐ বায়ুমণ্ডলে অক্সিজানগ্যাস বিশেষ নাই; অন্তত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ আছে তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও নাই। এইসকল কারণে মঙ্গলগ্রহ আমাদের মত জীবের বাসের অনুপযোগী বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন, মঙ্গলপৃষ্ঠে উদ্ভিদের জন্ম ও শামুকজাতীয় জীবের বাস সম্ভব হইতেও পারে।

কিন্তু মঙ্গলপৃষ্ঠ এককালে জীবের বাসের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল একথা একেবারে অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। সমুদয় গ্রহ-গুলির উপরিতল ও বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আমরা পরে করিব কিন্তু এস্থলে পৃথিবী, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া রাখা যাইতে পারে। মঙ্গলগ্রহটি দেখিতে রক্তবর্ণ। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে মঙ্গলপৃষ্ঠোপরি বায়ুমণ্ডলের প্রায় সমুদয় অক্সিজানগ্যাস ক্রমে শিলায় প্রবেশ করিয়া এই শিলাকে অক্সাইডে পরিবর্তিত করিয়াছে। ইঁট পোড়াইলে যেমন ইহার অধিকাংশ মালমসলা অক্সাইডে পরিণত হইয়া লাল হয়, সম্ভবত সেইরূপ মঙ্গলপৃষ্ঠের অধিকাংশ শিলা অক্সাইড অবস্থায় আছে সেইজন্য সমুদয় মঙ্গলগ্রহকে রক্তবর্ণ দেখায়। পৃথিবীর নিকটস্থ গ্রহউপগ্রহ-গুলির উপরিতল যতদূর দেখা গিয়াছে পাহাড়, সমতল ও উপত্যকা-পূর্ণ; কিন্তু মঙ্গলপৃষ্ঠে সেরূপ কোনো বৈচিত্র্য দেখা যায় না। ইহার

কারণ সম্ভবত মঙ্গলপৃষ্ঠ ক্রমশ রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে মরুভূমিময় সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কোটি কোটি বৎসর পর অপর গ্রহ হইতে দেখিলে আমাদের পৃথিবীকে বোধ হয় এইরূপ রক্তবর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন দেখাইবে। একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ ও গণনা দ্বারা অনুমান করিয়াছেন যে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল আকাশে প্রায় ৬০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বায়ুমণ্ডল এত অগভীর হওয়াতে মঙ্গলগ্রহ অতি অল্পসময়েই তাপবিকিরণ করিয়া অতিশয় শীতল হয়। পূর্বকালে বায়ুমণ্ডল সম্ভবত বৃহত্তর ছিল, মঙ্গলগ্রহের জড় আকর্ষণ কম বলিয়া এই বায়ুমণ্ডলের এক অংশ অতি ধীরে ধীরে শূন্যে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই অবস্থারই পূর্ণ পরিণতি বর্তমানে চন্দ্রে ও বুধগ্রহে দেখা যায় — ইহারা এক্ষণে সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডলহীন। বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল থাকিলে মঙ্গলপৃষ্ঠে পূর্বে উত্তাপের তারতম্য নিশ্চয়ই কম ছিল এবং গ্রহটি তখন মনুষ্যের মত জীবের বাসেরও নিশ্চয়ই উপযুক্ত ছিল। এইসকল অনুমান সত্য হইলে মনে করিতে হইবে যে মঙ্গলগ্রহ ক্রমবিকাশের ধারায় পৃথিবী অপেক্ষা প্রাচীনতর স্তরে অবস্থিত। ইহার উপরিতল পৃথিবীর উপরিতলের এক-চতুর্থাংশ হওয়ায় ইহা পৃথিবীর তুলনায় প্রাচীনতর যুগে শীতল হইয়া জীবের বাসের উপযুক্ত হইয়া পড়ে। লাওয়েলের পরিকল্পনা যদি সত্য হয় তবে সেই প্রাচীন যুগে মঙ্গলের জীব সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তাহাদের পূর্তশিল্প ও বিগত সভ্যতার নিদর্শনই হয়তো এক্ষণে আমরা মঙ্গলপৃষ্ঠে দেখিতে পাইতেছি। অধুনা সেই সভ্যতা ও তাহার বাহক সমুদয় জীব লুপ্ত হওয়াতে এই গ্রহটি একটি মৃত জগতে পরিণত হইয়াছে। মঙ্গলগ্রহ তাহার লুপ্ত প্রাচীন কীর্তি বক্ষে ধারণ করিয়া পৃথিবীকে রক্তবর্ণ চক্ষুর দৃষ্টিদ্বারা মানবসভ্যতার পরিণতির কথা বলিয়া দিতেছে।

ফোবোস্ ও ডেমিওস্ নামে মঙ্গলগ্রহের দুইটি চন্দ্র আছে। দুইটিই মঙ্গলগ্রহের অতি নিকটবর্তী — ফোবোস্ মাত্র ৪ হাজার মাইল এবং ডেমিওস্ ১৩ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। ডেমিওস্ প্রায় ৩০ ঘণ্টায়

ও ফোবোস্ মাত্র ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে গ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করে। গ্রহটি স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরিবার সময়ের মধ্যে ফোবোস্ তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে। এই কারণে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে: মঙ্গলের চন্দ্র ফোবোস্ পশ্চিমদিকে উদিত হইয়া পূর্বে অস্ত যায়। পৃথিবীতে যাহা অসম্ভব মঙ্গলে তাহাও নিশ্চিত সত্য হইয়া যায়। মঙ্গলের চন্দ্রদুইটি কিন্তু অতিশয় ক্ষুদ্র। ফোবোসের ব্যাস মাত্র দশ মাইল এবং ডেমিওসের ব্যাস প্রায় পাঁচ মাইল। চন্দ্র না বলিয়া দুইটি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডও ইহাদিগকে বলা যাইতে পারে। মঙ্গলগ্রহের সকল কথাই আশ্চর্যজনক ও রহস্যময়।

গ্রহকণিকা

মঙ্গলগ্রহের পর শূন্যে যে সহস্রাধিক গ্রহকণিকা আছে তাহা পূর্বে বলিয়াছি। অন্যান্য গ্রহের কক্ষের ন্যায় ইহাদের পথগুলি শূন্যে একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। একটির কক্ষের মধ্যে অপর একটিকে প্রায়ই প্রবেশ করিতে দেখা যায়। ১৯৩২ সালে 'এডোনিস' নামে একটি গ্রহকণিকা তাহার পথে চলিতে চলিতে পৃথিবী হইতে ১৩ লক্ষ মাইলের মধ্যে আসিয়াছিল। 'হারমিগ' নামে গ্রহকণিকা ১৯৩৭ সালে আমাদের মাত্র ৪ লক্ষ মাইল দূর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি গ্রহকণিকার সহিত দৈবাৎ পৃথিবীর সংঘর্ষ হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে। ভরসার কথা এই যে, প্রকৃত সংঘর্ষণের পূর্বেই পৃথিবীর প্রবল আকর্ষণে গ্রহকণিকাটি সম্ভবত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

বৃহস্পতি

সূর্য হইতে ৫'২ একর অন্তরে থাকিয়া সৌর জগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি প্রায় ১১ বৎসর ৯½ মাসে একবার সূর্যপ্রদক্ষিণ করে। বৃহস্পতি সকল বিষয়েই গ্রহের রাজা। আকারে ইহা পৃথিবীর প্রায়

১৩০০ গুণ, ইহার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১ গুণ সুতরাং বৃহস্পতির উপরিতল পৃথিবীর উপরিতলের প্রায় ১২১ গুণ। সৌর জগতের সমুদয় গ্রহ একত্র করিলেও তাহাদের মোট আয়তন ও ভর বৃহস্পতির আয়তন ও ভর হইতে কম হইবে। এ পর্যন্ত বৃহস্পতির ১১টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাদের বৃহত্তমটি বুধগ্রহ হইতেও বড়। বৃহস্পতির একটি ক্ষুদ্র উপগ্রহ গ্রহ হইতে এত দূরে যে তাহার গ্রহপ্রদক্ষিণ করিতে ৭০০ দিন লাগে। শূন্যে প্রায় ৩ কোটি মাইল ব্যাস জুড়িয়া বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি এই বৃহস্পতি। এই সীমানা অতিক্রম করিয়া তাহার রাজ্যে কোনো গ্রহকণিকা ধূমকেতু বা অপর সৌরবাসী প্রবেশ করিলেই বৃহস্পতির নিকট তাহাকে তাড়া খাইতে হয়।

রাত্রির আকাশে বৃহস্পতিকে একটি উজ্জ্বল তারার মত দেখায়। সন্ধ্যাকালে পূর্বাকাশে যখন বৃহস্পতিকে দেখা যায় তখন ইহা অতিশয় উজ্জ্বল, কারণ তখন গ্রহটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। সন্ধ্যা-কালে পশ্চিমাকাশে যখন ইহাকে দেখা যায় তখন পৃথিবী হইতে অতিশয় দূর বলিয়া ইহার উজ্জ্বলতাও কম হয়। বৃহস্পতির কক্ষটি পৃথিবীর কক্ষের বাহিরে। যখন পৃথিবী ও বৃহস্পতি পরস্পর নিকটবর্তী হয় তখন পৃথিবী বৃহস্পতি ও সূর্যের মধ্যস্থলে থাকে অর্থাৎ পৃথিবী হইতে দেখিলে সূর্য ও বৃহস্পতিকে আকাশের দুই বিপরীতদিকে দেখা যায়। সেইজন্য উজ্জ্বলতম অবস্থায় বৃহস্পতিকে সন্ধ্যাকাশে পূর্বদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বৃহস্পতিকে যখন সন্ধ্যাকাশে পশ্চিমদিকে দেখা যায় তখন তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট ও অনেক কম উজ্জ্বল।

দূরবীক্ষণযন্ত্রদ্বারা বৃহস্পতির গায়ে পটির ন্যায় দু-তিনটি কালো মোটা দাগ দেখা যায়। এই দাগগুলির মোটামুটি বিশেষ পরিবর্তন হয় না। ক্ষমতাশালী যন্ত্রদ্বারা আরও অনেক অপেক্ষাকৃত সরু দাগও দেখা যায়। এই দাগগুলি সাধারণত পরিবর্তনশীল। শুক্রগ্রহের ন্যায় বৃহস্পতিগ্রহের প্রকৃত পৃষ্ঠও আমরা দেখিতে পাই না। বৃহস্পতির
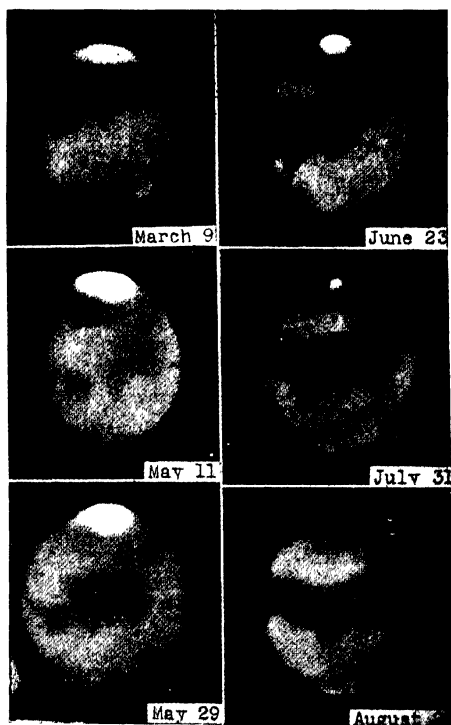
চিত্র ১১ — মঙ্গলগ্রহেব ঋতুপরিবর্তনেব সহিত তাহাব আলোকচিত্রের রূপেব পবিবর্তন হয়। প্রথম চিত্রে গ্রহের বসন্তঋতুর প্রারম্ভে উত্তবমেরুব তুষাবপ্রদেশটি বেশ বড়ই দেখায়। গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদেশটি ক্রমেই ছোট হয়। পঞ্চম চিত্রে (জুলাই ৩১) তুষারক্ষেত্র প্রায অন্তর্হিত হইয়াছে
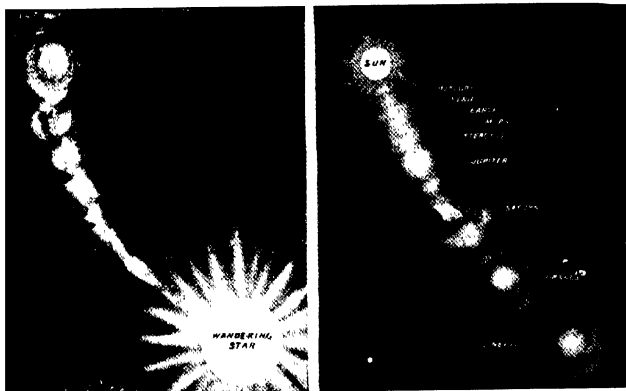
চিত্র ১২— জোয়াড়-মতবাদ অনুযায়ী সৌরজগৎ-সৃষ্টির একটি কাল্পনিক চিত্র। আদিম কালে একদা একটি বৃহৎ তারকা সূর্যের পাশ দিয়া চলিয়া যায়। তাহার প্রবল আকর্ষণে সূর্যের দেহ হইতে পদার্থ বাহির হইবার ফলে ক্রমে গ্রহউপগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে — ইহাই জোয়াড়-মতবাদ
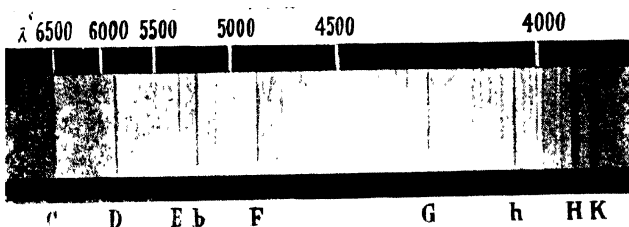
চিত্র ১৩ — সূর্যের বর্ণালী। এই চিত্রে CDE প্রভৃতি কতকগুলি ফ্রাউনহোফার বর্ণরেখা ও তাহাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিমাপ দেখান হইয়াছে

বায়ুমণ্ডল সর্বদা পুঞ্জীভূত মেঘে পরিপূর্ণ। দাগগুলি সম্ভবত বিভিন্ন মেঘস্তরের চিহ্ন। এই কালো দাগগুলি ছাড়াও কতকগুলি লাল ও ঈষৎ হলদে স্থান বৃহস্পতির উপর দেখা যায়। এইরূপ একটি প্রকাণ্ড লাল দাগ ১৮৭৮ সালে বিশেষ পরিস্ফুট হয় এবং এখনও তাঁহা সম্পূর্ণ বিলীন হয় নাই।

অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল অতি বিশাল, সম্ভবত কয়েক হাজার মাইল গভীর। এই বায়ুমণ্ডলের নীচে বৃহস্পতির প্রকৃত শিলাময় পৃষ্ঠ বর্তমান। ইহার একটি শিলাময় পিণ্ড আছে। পিণ্ডটি কয়েক হাজার মাইল পুরু একটি বরফের স্তরে আবৃত। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল প্রবল ঝঞ্ঝা ও বাত্যাবিক্ষুব্ধ। ইহার তুলনা আমরা কোথায়ও দেখিতে পাই না।

সম্প্রতি বৃহস্পতির আলোক বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গিয়াছে যে ইহার বায়ুমণ্ডলে অ্যামোনিয়া ও মার্শগ্যাস আছে। এই দুই গ্যাসই মানুষের পক্ষে বিষ। সুতরাং বৃহস্পতিগ্রহে মনুষ্যের বাস অসম্ভব। বস্তুত গ্রহের ক্রমবিকাশের ধারায় বৃহস্পতির স্থান পৃথিবীর নীচে। যে অর্থে মঙ্গলগ্রহকে পৃথিবী অপেক্ষা প্রাচীনতর বলা যাইতে পারে, সেই অর্থে বৃহস্পতি অপেক্ষাকৃত নবীন। ক্রমবিকাশের ধারায় মঙ্গলগ্রহ সম্ভবত পূর্ণবয়স্ক পৃথিবীর অবস্থা অতিক্রম করিয়া বর্তমানে বার্ধক্যে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু যুবক বৃহস্পতির আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর ক্রমবিকাশের পথে চলিবার পর পৃথিবীর অবস্থায় পৌঁছিবার সম্ভাবনা আছে বলা যাইতে পারে।

সূর্য হইতে অনেক দূর বলিয়া বৃহস্পতিগ্রহ অতি শীতল। তাপমান যন্ত্রে ইহার উত্তাপ ২০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এই উত্তাপে (শৈত্যে) অ্যামোনিয়া গ্যাস জমিতে আরম্ভ করে। এই জমানো অ্যামোনিয়াই বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে খুব বেশি বলিয়া মনে হয়।

ভীমকায় বৃহস্পতির আবর্তনগতি অতি দ্রুত। মাত্র ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে বৃহস্পতি তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া যায় অর্থাৎ আমাদের একদিনে বৃহস্পতির প্রায় আড়াই দিন। এই দ্রুত

আবর্তনের জন্য বৃহস্পতির উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বেশি চাপা। দূরবীক্ষণযন্ত্রে বৃহস্পতিকে মোটেই গোল দেখায় না।

এ পর্যন্ত বৃহস্পতির এগারোটি চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চারটি প্রথম গ্যালিলিও দেখিতে পান। এই চারটি উপগ্রহকে প্রায় একই পথে বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিতে দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে এই চারটির একটি, দুইটি, তিনটি কিংবা চারটিকেই গ্রহটির একই কিংবা বিভিন্ন পার্শ্বে একটি সরল রেখায় দেখা যায়। গ্রহণের জন্য, অর্থাৎ গ্রহের আড়ালে পড়ার দরুন, এই চন্দ্রের কোনো-কোনোটি সময় সময় অন্তর্হিত হয়। ১৯১৪ সালে বৃহস্পতির নবম চন্দ্রটি আবিষ্কৃত হয়। ১৯৩৮ সালে আমেরিকার লিক্ মানমন্দির হইতে দশম ও একাদশ চন্দ্রকে আবিষ্কার করা হইয়াছে। প্রথম চারটি চন্দ্র বাদ দিলে অন্য সবগুলিই বেশ ছোটো। ইহাঁদের সকলের ব্যাসই ১০০ হইতে ১৫ মাইলের মধ্যে।

শনি

সৌরজগতের ষষ্ঠগ্রহ শনির সূর্য হইতে দূরত্ব বৃহস্পতির দূরত্বের প্রায় দ্বিগুণ। শনিকে খালিচোখে মোটামুটি একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল তারার মতোই মনে হয়। প্রাচীনেরা শনিকেই শেষ গ্রহ বলিয়া জানিতেন; কারণ, সপ্তম গ্রহটিকে খালিচোখে দেখা যায় না। শনিগ্রহের সূর্যপ্রদক্ষিণ করিতে প্রায় ২৯½ দিন লাগে। ঠিক এক বৎসর পর গ্রহটিকে আকাশে প্রায় ১২ ডিগ্রি পূর্বদিকে সরিয়া যাইতে দেখা যায় এবং গ্রহটি প্রায় আড়াই বৎসরে এক-একটি রাশি অতিক্রম করে।

আকার ও ভর হিসাবে শনির স্থান বৃহস্পতির ঠিক নীচে। শনির ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ৯ গুণেরও বেশি এবং আকারে ইহা পৃথিবীর প্রায় ৮০০ গুণ। সুতরাং শনিও বৃহস্পতির ন্যায় ভীমকায় গ্রহ, কিন্তু ইহার ভর মোটেই তদনুরূপ নয়। পৃথিবী আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫·৫ অর্থাৎ ঠিক পৃথিবীর আকারের একটি জলীয় বর্তুল অপেক্ষা পৃথিবী ৫॥ গুণ ভারী। বৃহস্পতির আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৩, কিন্তু শনিগ্রহের

আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র ০·৭, অর্থাৎ শনিকে একটি বিশাল সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে গ্রহটি না ডুবিয়া ভাসিতে থাকিবে। গ্রহগুলির মধ্যে শনিই গড়ে লঘুতম পদার্থ দ্বারা গঠিত।

এযাবৎ শনিগ্রহের নয়টি চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এত অনুচরবৃন্দ সত্ত্বেও শনিগ্রহ সম্বন্ধে কৌতূহলের কেন্দ্র তাহার বলয়শ্রেণী ও তাহাদের অনুরূপ সৌন্দর্য। দূরবীক্ষণযন্ত্রে গ্রহটির ঈষৎ হেমকান্তি এবং তাহার ঠিক মধ্যস্থল বেষ্টন করিয়া আলোকমণ্ডিত বলয়শ্রেণীর শোভা আকাশের একটি অপূর্ব সৌন্দর্য। তিনটি বলয় এক সমতলে থাকিয়া গ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। A নামক বহির্বলয়টি প্রস্থে প্রায় ১০ হাজার মাইল; B নামক মধ্যবলয়টির প্রস্থ ১৬ হাজার এবং C নামক অন্তর্বলয়টির প্রস্থ প্রায় ১১½ হাজার মাইল। অন্তর্বলয়টি শনিপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৭ হাজার মাইল উচ্চে অবস্থিত। বলয়গুলির মধ্যে যে শূন্যস্থান আছে তাহা দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা হইয়াছে।

বলয়গুলি মোটেই পুরু নয় অর্থাৎ ইহাদের বেধ অতিশয় কম, ১০ মাইলের অধিক হইবে না। ইহারা গ্রহের বিষুবরেখার সমতলে অবস্থিত। গ্রহের বিভিন্ন অবস্থানে বলয়ের উপরিতল কিংবা নিম্নতল মাত্র দেখা যায়। যখন বলয়ের পার্শ্বদেশ পৃথিবীর দিকে থাকে, তখন তাহাকে একটি সরলরেখা বলিয়া মনে হয় এবং একটি কমলালেবু শলাদ্বারা বিদ্ধ করিলে যেমন হয়, শনিগ্রহ ও বলয়শ্রেণীকে সেইরূপ দেখায়। বলয়ের সমতল আমাদের ঠিক দৃষ্টিরেখায় থাকিলে কয়েক-দিনের জন্য বলয়টি অদৃশ্য হইয়া যায়। বলয়ের বেধ অতি কম বলিয়াই এইরূপ দেখায়। মধ্যবলয়কে "উজ্জ্বল বলয়" বলা হয়; কারণ, অধিক সূর্যালোক প্রতিফলিত হওয়াতে তাহাকে সকল সময় প্রায় শনিগ্রহের ন্যায়ই উজ্জ্বল দেখায়। অন্য বলয়গুলি এত উজ্জ্বল নয়। অন্তর্বলয়টি যে বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড অংশদ্বারা গঠিত তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই এবং দূরবীক্ষণযন্ত্রেও তাহা বেশ ধরা পড়ে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বলয়গুলি সাধারণত বিচ্ছিন্ন উল্কাপিণ্ড এবং ধূলার ন্যায় ক্ষুদ্র পদার্থ দ্বারা গঠিত। বলবিজ্ঞানের দিক

হইতে এইরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। শনিগ্রহের এত নিকটে পাতের মত সরু কোনো অবিচ্ছিন্ন পদার্থের চাক্‌তি থাকিলে শনির জড়-আকর্ষণ হেতু ইহার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বলের প্রয়োগ হইবে। নিকটবর্তী অংশে বল দূরবর্তী অংশ অপেক্ষা এত অধিক হইবে যে, চাক্‌তিটি ফাটিয়া নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। সুতরাং পাতের মত সরু চাক্‌তি গ্রহের এত নিকটে থাকিয়া অক্ষত অবস্থায় তাহার চারিদিকে ঘোরার কল্পনা একেবারে অসম্ভব। শনিবলয় যে উল্কাজাতীয় বিচ্ছিন্ন পদার্থদ্বারা গঠিত, তাহার এক প্রমাণ এই যে, অন্তর্বলয়ের মধ্য দিয়া সময়ে সময়ে আবছায়া শনিপৃষ্ঠে দেখা যায়, যেমন ঈষৎ-স্বচ্ছ কাপড়ের মধ্য দিয়া বিপরীত দিকের পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। বলয় হইতে প্রতিফলিত সূর্যালোক পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, এই বলয়ের ভিতরের পার্শ্বের পদার্থ সেকেণ্ডে বারো মাইল এবং বাহিরের পার্শ্বের পদার্থ সেকেণ্ডে দশ মাইল বেগে ঘুরিতেছে। বলবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে ঐ বিভিন্ন দূরের পদার্থ-খণ্ডগুলির ঠিক ঐ বেগেই ঘুরিবার কথা। সুতরাং মধ্যবলয়ও যে অবিচ্ছিন্ন পদার্থদ্বারা গঠিত নয় একথা বলা যাইতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই উল্কাখণ্ড ও ধূলিকণাগঠিত বলয় শনিগ্রহে কোথা হইতে আসিল? অন্য কোনো গ্রহে কিন্তু এইরূপ বলয় দেখা যায় না। বলবিজ্ঞান হইতে ইহার একটা সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়। বলবিজ্ঞানের নিয়ম অবলম্বন করিয়া গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, শনিগ্রহ অপেক্ষা ছোটো একটি তরল পদার্থের গোলক যখন গ্রহের ক্রমশ নিকটে আসিতে থাকে, তখন গ্রহ হইতে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করিলেই গোলকটি বহু ক্ষুদ্রতর গোলকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপ ক্ষুদ্র অংশগুলি একত্রিত হইয়া একটি বৃহৎ গোলক সৃষ্টি করিতে পারে না। ঐ নির্দিষ্ট দূরত্বের বাহিরে গোলকটি গোলক অবস্থায় থাকিতে পারে, তাহার ধ্বংস হইবার আশঙ্কা নাই। শনিগ্রহের নয়টি চন্দ্র আছে, তাহারা সকলেই শনিবলয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত। সুতরাং একটি স্বাভাবিক

কল্পনা এই যে, সুদূর অতীতে শনিগ্রহের নিকটস্থিত একটি উপগ্রহ কোনো কারণে বিপজ্জনক দূরত্বটি অতিক্রম করাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেই এক চন্দ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটি চন্দ্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রায় একই সমতলে বিভিন্ন দূরত্বে থাকিয়া শনিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাদের দ্বারা সূর্যালোক প্রতিফলিত হইতেছে, সুদূর পৃথিবী হইতে সেই প্রতিফলিত আলোক দেখিয়া এই চন্দ্রগোষ্ঠীকে আমরা বলয় বলিয়া মনে করি। কেহ কেহ বলেন, ঐ চন্দ্রের ধ্বংস শনিগ্রহের একটি উপগ্রহ দ্বারা ঘটিয়াছে। তাহাতে তিনটি বিভিন্ন বলয় সৃষ্টির কারণের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

শনিগ্রহও বৃহস্পতির ন্যায় ক্রমবিকাশের নিম্নস্তরে অবস্থিত। শনিগ্রহের একদিন আমাদের মাত্র সওয়া-দশ-ঘণ্টা। এই দ্রুত ঘূর্ণনের জন্য শনিগ্রহের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বিশেষ চাপা। বৃহস্পতির ন্যায় শনিগ্রহও ঘনমেঘপুঞ্জে আবৃত এবং ফিতার ন্যায় কতকগুলি কালো দাগও তাহাতে দেখা যায়। সূর্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া ইহার উপরিতলের তাপমান প্রায় ৩০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট। শনিগ্রহের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া জানা যায় যে, তাহার বায়ুমণ্ডল বৃহস্পতির ন্যায় অ্যামোনিয়া ও মার্শগ্যাস দ্বারা পূর্ণ। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে অ্যামোনিয়া অধিক, শনির বায়ুমণ্ডলে মার্শগ্যাস অধিক। বৃহস্পতি হইতে শনি অধিকতর শীতল বলিয়া তাহার বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ অ্যামোনিয়া তরল অথবা কঠিন অবস্থায় গ্রহপৃষ্ঠে পড়িয়া আছে। শনির আপেক্ষিক গুরুত্ব অতি কম বলিয়া জ্যোতির্বিদরা মনে করেন, শনিগ্রহের বায়ুমণ্ডল অতি প্রকাণ্ড, প্রায় ১৬ হাজার মাইল গভীর। বায়ুমণ্ডলের সমুদয় জল জমিয়া বরফ হইয়া শিলাময় শনিপৃষ্ঠকে প্রায় ৬ হাজার মাইল পুরু একটি আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই আবরণের নীচে শনির দেহপিণ্ড ২৮ হাজার মাইলের অধিক গভীর বলিয়া মনে হয় না। শনিদেহের বায়ুমণ্ডল এত বিশাল যে, তাহার প্রায় অর্ধেক ভরই বায়ুমণ্ডল দ্বারা সৃষ্ট।

ইউরেনাস ও নেপচুন

সৌরজগতের সপ্তম ও অষ্টম গ্রহ যথাক্রমে ইউরেনাস ও নেপচুন। সূর্য হইতে ইহাদের দূরত্ব যথাক্রমে ১৯ ও ৩০ একক অর্থাৎ ইউরেনাস ও নেপচুন শনিগ্রহের কিঞ্চিদধিক দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ দূরে অবস্থিত। এই বিশাল দূরত্বের জন্য ইহাদিগকে খালিচোখে দেখা যায় না। কেবলমাত্র ইউরেনাস যখন পৃথিবীর নিকটতম হয়, তখন তাহার অবস্থান জানা থাকিলে খালিচোখে দেখা যাইতে পারে। নেপচুন অপেক্ষা ইউরেনাস কিছু বড়ো, কিন্তু আকারে পৃথিবীর প্রায় ৬৪ গুণ। সুতরাং সৌরজগতের বৃহত্তর গ্রহের মধ্যেই ইহারা পরিগণিত হয়। কিন্তু ইহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব পৃথিবী অপেক্ষা কম। পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব ইউরেনাসের প্রায় ৪½ গুণ ও নেপচুনের ৩½ গুণ। আকারে ইহারা এত বৃহৎ কিন্তু আপেক্ষিক গুরুত্ব কম বলিয়া মনে হয় বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের ন্যায় ইহাদের আবরণের অধিকাংশই বায়ুমণ্ডল। সূর্য হইতে বিশাল দূরত্বের জন্য ইহাদের পৃষ্ঠ অতিশয় শীতল। উভয়েরই ঘূর্ণনগতি অতি দ্রুত। ইউরেনাস প্রায় ১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে ও নেপচুন প্রায় ১৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে নিজ নিজ মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে একবার ঘোরে। ইউরেনাসের চারিটি ও নেপচুনের একটিমাত্র চন্দ্র দেখা গিয়াছে। ইহাদের গতিপথ এত বিশাল যে, সূর্যপ্রদক্ষিণ করিতে ইউরেনাস ও নেপচুনের যথাক্রমে প্রায় ৮৪ ও ১৬৫ বৎসর লাগে।

পৃথিবী ও শুক্রগ্রহের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকার জন্য যেমন ইহাদের জুড়িগ্রহ বলা হয়, সেইরূপ ইউরেনাস ও নেপচুনকেও জুড়িগ্রহ বলা যাইতে পারে। উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও অপর একটি বিষয়ে ইউরেনাস ও নেপচুনের অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। পৃথিবীর বিষুবরেখা তাহার কক্ষের সমতলের সহিত ২৩½ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত। কিন্তু ইউরেনাসের বিষুবরেখা তাহার কক্ষের সমতলের উপর প্রায় লম্বভাবে অবস্থিত। ঠিক লম্বভাবে না বলিয়া

বলা উচিত ৯৮ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত। ফলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতেও সূর্যালোক লম্বভাবে পড়ে এবং সকলস্থানেই ঋতুপরিবর্তন বিশেষ লক্ষ্যিত হয়। পক্ষান্তরে গ্রহের আবর্তনগতি তাহার কক্ষের উপর গতির বিপরীতমুখী। পৃথিবীর বার্ষিকগতি ও আহ্নিকগতি প্রতিমুহূর্তে শূন্যে আমাদিগকে এক দিকেই লইয়া যায়। অপর গ্রহের পক্ষেও একথা খাটে। কিন্তু ইউরেনাস নেপচুন এবং তাহাদের পাঁচটি উপগ্রহের ক্ষেত্রে এই দুই গতি বিপরীতমুখী।

ইউরেনাস ও নেপচুনের আবিষ্কারের কথা অতি চমৎকার। ১৭৮১ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ হার্শেল ও তাঁহার ভগ্নী কেরোলিন দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে আকাশের বিভিন্ন অংশের সমুদয় তারকার একটি নক্সা প্রস্তুত করিতেছিলেন। মিথুনরাশির নক্ষত্রগুলির পরীক্ষা-কালে হার্শেল লক্ষ্য করেন যে, একটি নক্ষত্র কিছুকালের মধ্যে আকাশে স্থানপরিবর্তন করিয়াছে। প্রথমে তিনি ইহাকে ধূমকেতু মনে করেন। পরে ইহার গতি হইতে কক্ষ গণনাদ্বারা বুঝা গেল এটি একটি গ্রহ। ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় জর্জের নামে হার্শেল গ্রহটির নামকরণ করিলেন জর্জ সিডোনিস। হার্শেল কিছুকাল পূর্বেই রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি রাজা জর্জের নাম অমর করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই নাম টিকিল না। জ্যোতির্বিদমহলে পৃথিবীর এই প্রথম-আবিষ্কৃত গ্রহটি প্রথমত "হার্শেল" নামে পরিচিত হইল। অবশেষে বার্লিন মান-মন্দিরের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বোডে প্রদত্ত গ্রীক পুরাণ হইতে গৃহীত ইউরেনাস নামটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। পরে দেখা গেল, ১৭৫০ হইতে ১৭৭১ সালের মধ্যে ফরাসী জ্যোতির্বিদ লেমোনিয়ে এই গ্রহটি বারো বার পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। লেমোনিয়ে তাঁহার পর্যবেক্ষণের ফল যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করিতেন না বলিয়া প্রতিবারেই তিনি গ্রহটিকে নক্ষত্র বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আরাগো বলিয়া গিয়াছেন যে, একটা চুলের পাউডার রাখার কাগজের থলির উপর হার্শেলের বহুপূর্বে

লেমোনিয়ে একবার তাঁহার ইউরেনাস পর্যবেক্ষণের ফল টুকিয়া রাখিয়াছিলেন।

নেপচুন-আবিষ্কারের কথা আরও চমকপ্রদ। ইউরেনাস-আবিষ্কারের কিছুকাল পরে দেখা গেল, গণিতের সাহায্যে প্রাপ্ত ইউরেনাসের গতির সহিত তাহার আকাশে প্রকৃত গতির কিছু গরমিল হইতেছে। ১৮৪০ সালেও যেটুকু গরমিল হইল তাহা চোখে দেখিয়া ধরা যায় না। কিন্তু ইহাও জ্যোতির্বিদদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। অনেকে মনে করিলেন ইউরেনাসের পরও একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহ আছে, তাহার আকর্ষণই এই গরমিলের হেতু। দুইটি তরুণ জ্যোতিবিদ অ্যাডামস্ ও লেভেরিয়ে ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ ও ফ্রান্সের প্যারিসে বসিয়া গণিতের সাহায্যে হিসাব করিতে বসিলেন, ঐ অনাবিষ্কৃত গ্রহটি আকাশের কোন্ স্থানে থাকিলে উপরোক্ত গরমিল সম্ভব। অ্যাডামসের গণনা প্রথমে শেষ হইল। তিনি তাঁহার গণনার ফল ইংলণ্ডের রাজজ্যোতির্বিদকে জানাইয়া লুক্কায়িত গ্রহটি খুঁজিতে অনুরোধ করিলেন। ইংলণ্ডের মানমন্দিরে তখন তারামণ্ডলের একটি ভালো নকসা না থাকাতে অনুসন্ধানের কাজে বিলম্ব হইল এবং নূতন গ্রহেরও কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। এদিকে লেভেরিয়ে তাঁহার গণনার ফল বার্লিন মানমন্দিরের জ্যোতিবিদ গালে-কে জানাইয়া লিখিলেন, 'আপনি আকাশের অমুক দিকে দূরবীক্ষণযন্ত্র ফিরাইয়া পর্যবেক্ষণ করিলেই নূতন গ্রহটি দেখিতে পাইবেন।' গালে তাঁহার যন্ত্র ঐ দিকে ঘুরাইয়া অতি সহজেই লেভেরিয়ে কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে নূতন গ্রহটি দেখিতে পাইলেন। এইরূপে গণিতের সাহায্যে সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ আবিষ্কৃত হইল।

অ্যাডামস্ ও লেভেরিয়ের পথ অনুসরণ করিয়াই ১৯৩০ সালে সৌরজগতের নবম গ্রহ প্লুটোকে আবিষ্কার করা হইয়াছে। নেপচুনের ক্ষেত্রেও গণনা ও পর্যবেক্ষণের ফলে কিছু গরমিল হওয়ায় পারসিভ্যাল লাওয়েল প্রমুখ জ্যোতির্বিদ্গণের বিশ্বাস হইল নেপচুনের বাহিরেও

সৌরজগতে গ্রহ আছে, তাহার আকর্ষণের ফলেই এই গরমিল। ইউরেনাসেরও একটু গরমিল শেষ পর্যন্ত রহিয়া গিয়াছিল। ১৯১৫ সালে লাওয়েল আকাশের এই নূতন গ্রহের জন্য গণনা আরম্ভ করিলেন এবং পরে লাওয়েল মানমন্দির হইতে এই গ্রহের অন্বেষণও আরম্ভ হইল। লাওয়েল এই অন্বেষণের ফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯৩০ সালে টমবাউ নামে লাওয়েল মানমন্দিরের একজন যুবক রিসার্চ-অ্যাসিট্যাণ্ট নূতন গ্রহটি প্রথম দেখিতে পান। এই গ্রহের নামের প্রথম দুইটি অক্ষর (P ও L) পারসিভ্যাল লাওয়েলের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়।

প্লুটো সূর্য হইতে চল্লিশ একক অন্তরে অবস্থিত অর্থাৎ সূর্য হইতে ইহার দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্বের চল্লিশ গুণ। সুদূর আকাশে অবস্থিত এই গ্রহটি এত শীতল যে, ইহার বায়ুমণ্ডলের সমস্ত পদার্থ নিশ্চয়ই জমিয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে। প্লুটোর আকার ও ভার এখনও প্রায় অজ্ঞাত। সম্ভবত আকারে ইহা পৃথিবীর সমান কিংবা পৃথিবী হইতে ছোটো। প্লুটোর গতি এতই মন্থর যে, সূর্যপ্রদক্ষিণ করিতে ইহার প্রায় ২৫০ বৎসর লাগে। ইহার কক্ষও অতি অদ্ভুত। এক স্থানে ইহা নেপচুনের কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গিয়াছে।

প্লুটো হইতে দেখিলে সূর্যকে মাত্র একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দেখাইবে। সূর্যকে চাকৃতির মত মোটেই দেখা যাইবে না, কিন্তু তাহার উজ্জ্বলতা পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বলতার প্রায় ৩০০ গুণ বলিয়া মনে হইবে। বৃহস্পতি ও শনি ব্যতীত অপর কোনো গ্রহকেই খালিচোখে প্লুটো হইতে দেখা যাইবে না। এই দুইটি গ্রহ প্লুটোর শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা, ঠিক সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর মাত্র ইহাদের দেখিতে পাওয়া যাইবে। পৃথিবী ও শুক্র সূর্যের অতি নিকট বলিয়া দূরবীক্ষণযন্ত্রেও ইহাদের দেখা যাইবে কি না সন্দেহ।

অনেকে মনে করেন, প্লুটোর পরেও সৌরজগতের এক কিংবা একাধিক গ্রহ আছে। প্লুটোর আকর্ষণ ধরিয়া হিসাব করিয়াও নেপচুনের পূর্বোক্ত গরমিল সম্পূর্ণ মিটিয়া যায় নাই। কাজেই

প্লুটোর পরও গ্রহের অস্তিত্বের সম্ভাবনা রহিয়া গেল। বস্তুত প্লুটোবহির্ভূত গ্রহের অন্বেষণ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

সৌরজগতের উৎপত্তি

সৌরজগতের গ্রহউপগ্রহগুলির গতিতে এরূপ সুন্দর শৃঙ্খলা দেখা যায় যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধ থাকার কথা স্বতই মনে হয়। প্রথমত প্লুটোকে বাদ দিলে গ্রহগুলি সকলেই প্রায় এক সমতলে থাকিয়া সূর্যপ্রদক্ষিণ করিতেছে। সমতলের উপর হইতে প্লুটোসমেত সমস্ত গ্রহেরই দক্ষিণাবর্ত্ত প্রদক্ষিণগতি * লক্ষ্যিত হয়। দুইটি দূরবর্তী গ্রহ ইউরেনাস ও নেপচুনকে বাদ দিলে অন্য সকল গ্রহের স্বীয় মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে আবর্তনগতিও বামাবর্তে অর্থাৎ তাহাদের সূর্য-প্রদক্ষিণ গতিরই অনুরূপ। প্লুটোর কথা এখন পর্যন্ত জানা যায় নাই। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দুইটি দূরবর্তী গ্রহের, যথা ইউরেনাস ও নেপচুনের, ক্ষেত্রে হইয়াছে। তাহাদের আবর্তনগতি বামাবর্তে। অপর পক্ষে গ্রহগুলির যে সকল উপগ্রহ আছে তাহার প্রায় সকলেই দক্ষিণা-বর্তে গ্রহপ্রদক্ষিণ করে। ব্যতিক্রম হইয়াছে দূরবর্তী গ্রহ ইউরেনাস ও নেপচুনের উপগ্রহের ক্ষেত্রে, এবং বৃহস্পতির দূরতম দুইটি উপগ্রহ ও শনির দূরতম উপগ্রহটির ক্ষেত্রে। আশ্চর্যের বিষয়, সূর্যের বিষুবরেখা প্রায় গ্রহগুলির কক্ষের সমতলেই অবস্থিত এবং সূর্যের মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে আবর্তন গতিও বামাবর্তে।

জর্মান দার্শনিক কাণ্ট ও বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত লাপ্লাস সর্বপ্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন যে, সূর্য আদিম অবস্থায় এক ভীমকায় নীহারিকা-পিণ্ড ছিল। তখন তাহার দেহ বর্তমান সময়ের বহুগুণ হইয়া শূন্যে ব্যাপিয়া ছিল। লাপ্লাসের মতে এই বিশাল নীহারিকা-পিণ্ড যখন শীতল হইতে থাকে, তখন তাহার গ্যাসদেহ ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়।

* ঘড়ির কাঁটার গতিকে দক্ষিণাবর্তগতি বলা হয় আর তার বিপরীত গতির নাম বামাবর্তগতি

গ্যাসপিণ্ডের আবর্তনগতির জন্ম তাহার বিষুবরেখার কিয়দংশ সঙ্কোচমান পিণ্ড হইতে শূন্যে স্বীয়স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপে শূন্যে শনির বলয়ের ন্যায় একটি আবর্তনশীল বলয়ের সৃষ্টি হয়। গ্যাসপিণ্ড ক্রমে শীতল হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরপর এই প্রকার কতকগুলি বলয়ের জন্ম হয়। বলয়গুলি শূন্যে সে অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিতে পারে নাই। প্রত্যেকটি বলয় আবার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কালক্রমে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি একত্রিত হইয়া এক-একটি গ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে। লাপ্লাসের মতবাদ এখন অচল, কারণ একথা এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভগ্নবলয়ের ক্ষুদ্র অংশগুলির পুনরায় একত্রিত হইয়া একটি গ্রহপিণ্ড সৃষ্টি করিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বরং তাহারা ক্রমে শীতল ও কঠিন হইয়া লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র চন্দ্র ও উল্কার সৃষ্টি করিবে। বলবিজ্ঞানের দিক হইতে লাপ্লাসের পরিকল্পনার আর-একটি প্রবল আপত্তি উঠিতে পারে। একখণ্ড পাথর একটি সুতার একদিকে বাঁধিয়া অপর দিক হাতে লইয়া সুতাটি ঘুরাইলে পাথরটিও সুতার সঙ্গে ঘুরিতে থাকিবে। এই পাথর-খণ্ডের গতির একটি সর্বাঙ্গীণ পরিমাপ তাহার গতিবেগ, ভর ও সুতার দৈর্ঘ্য দ্বারা করা হয়। তাহাকে ঘূর্ণিভরবেগ বলে। যে সকল বস্তুর কোনো এক প্রকার ঘূর্ণন আছে, তাহাদের সকলেরই ঘূর্ণিভরবেগ আছে। বলবিজ্ঞানের একটি সূত্র এই যে, বাহির হইতে বলপ্রয়োগ না হইলে কোনো বস্তুর ঘূর্ণিভরবেগের পরিবর্তন হয় না, বস্তুটির যেরূপ পরিবর্তনই হউক না কেন। সুতরাং লাপ্লাসের পরিকল্পনা যদি সত্য হয় তবে সূর্যের আদিম অবস্থায় তাহার যে ঘূর্ণিভরবেগ ছিল, তাহা বর্তমানে সূর্য ও সমুদয় গ্রহউপগ্রহের সমবেত ঘূর্ণিভরবেগের সমান হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে সমগ্র সৌরজগতের সমবেত ঘূর্ণিভরবেগের শতকরা দুই ভাগ মাত্র সূর্যদেহে ও অপর ৯৮ ভাগ গ্রহউপগ্রহগুলিতে আছে—বৃহস্পতিগ্রহেই সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু সূর্যের ভর সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের সমবেত ভরেরও প্রায় ৭৫০ গুণ। এত অধিক ভর থাকা সত্ত্বেও সৌরজগতের সমুদয় ঘূর্ণিভরবেগের এত ক্ষুদ্র অংশ এখন সূর্যে

থাকায় লাপ্লাসের পরিকল্পনাটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। এই পরিকল্পনা অনুসারে ভরের অনুপাতে সূর্যেরই বেশি ঘূর্ণি-ভরবেগ থাকিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমেরিকার জ্যোতির্বিদ্ মুল্‌টন ও ভূতত্ত্ববিদ্ চেম্বারলেন সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি নূতন মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহাদের মতে বহু সহস্রকোটি বৎসর পূর্বে প্রায় আমাদের সূর্যেরই মত কিংবা তাহা অপেক্ষা বড়ো আকাশের একটি নক্ষত্র সূর্যের নিকট দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া যায়। চন্দ্রের আকর্ষণে যেমন পৃথিবীর উপরিভাগস্থিত জলে জোয়ারের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ ঐ নক্ষত্র সূর্যের নিকটবর্তী হইলে তাহার প্রবল আকর্ষণে সূর্যের এক অংশ ক্রমশ উচ্চ হইতে থাকে এবং পরে তাহা জলস্তম্ভের ন্যায় আকাশে উত্থিত হইয়া নক্ষত্রটির দিকে ধাবিত হয়। সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন এইরূপ কয়েকটি অংশ প্রথমত নক্ষত্রটির আকর্ষণে তাহাকে কিছুদূর অনুসরণ করে এবং সেই সময়ের মধ্যে এই অংশগুলিতে সূর্যের চতুর্দিকে এক ঘূর্ণিভরবেগের সৃষ্টি হয়। আগন্তুক নক্ষত্রটি ক্রমশ দূরে চলিয়া যায়। অনুসরণকারী বিচ্ছিন্ন অংশগুলি ঠিক তাহাতে পৌঁছিতে পারে না কিন্তু তাহাদের বেগ এত অধিক থাকে যে, সূর্যও তাহাদের পুনরায় গ্রাস করিতে অসমর্থ হয়। তাহাদের ঘূর্ণিবেগের দরুন তাহারা সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করে। সূর্য হইতে উত্থিত হইবার কালে পিণ্ডাকৃতি না হইয়া জলস্তম্ভের ন্যায় লম্বা দড়ির আকৃতিতে তাহারা থাকে এবং পরে প্রথমত কতকগুলি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে। চেম্বারলেন ও মুল্‌টনের মতে ঐ বৃহৎ খণ্ডগুলি প্রথমত উল্কার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া শীতল হয় এবং পরে এই ক্ষুদ্র উল্কা খণ্ড-গুলিই একত্রিত হইয়া ক্রমশ এক-একটি গ্রহের সৃষ্টি করে। তাঁহাদের মতে এইরূপ ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন বহু খণ্ড এখনও ঝাঁকে ঝাঁকে শূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং কখনো কখনো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া উল্কারূপে আমাদের দেখা দিতেছে। জীন্স, জেফ্রিস্ প্রমুখ ইংরেজ পণ্ডিতেরা পরে এই মতবাদের কিছু পরিবর্তন করেন। তাঁহারা বলেন,

বিচ্ছিন্ন অংশগুলি শূন্যে তরল অবস্থাতেই ক্রমশ পিণ্ডাকৃতি হইয়া এক-একটি গ্রহ সৃষ্টি করে। উল্কার ন্যায় ক্ষুদ্র খণ্ডে বিচ্ছিন্ন ইহারা কখনো হয় নাই। এই মতবাদ অবলম্বন করিলে সৌরজগতের শৃঙ্খলার অধিকাংশই সহজে বুঝা যায়। সৌরজগতের সমবেত ঘূর্ণিভরবেগের অধিকাংশ আগন্তুক নক্ষত্রের দান, সুতরাং সৌরজগতের বর্তমান সমবেত ঘূর্ণিভরবেগের সূর্যে ও গ্রহগুলিতে অসমবণ্টনে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। অপরপক্ষে সূর্য হইতে উত্থিত অংশগুলিতে প্রথম যে দিকে ঘূর্ণিবেগ সৃষ্টি হইয়াছিল, গ্রহগুলির সকলেই সেই দিকে সূর্যপ্রদক্ষিণ করিবে। বস্তুত আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, তাহারা সকলেই বামাবর্তে সূর্যপ্রদক্ষিণ করে। অধিকন্তু গ্রহসৃষ্টির ইতিহাস এই প্রকার হইলে তাহাদের কক্ষসমতলেরও অধিক তারতম্য হইবার কারণ নাই। বলবিজ্ঞানের জটিল গণনাও এই সিদ্ধান্তগুলিকে মোটামুটি সমর্থন করে। লাপ্লাস্, চেম্বারলেন, মুল্টন ও জীন্স প্রমুখ পণ্ডিত প্রবর্তিত মতবাদগুলি যথাক্রমে নীহারিকা মতবাদ (nebular theory), গ্রহকণিকা মতবাদ (planetesimal theory) ও জোয়ার মতবাদ (tidal theory) নামে পরিচিত।

বহুকাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীমহলে জোয়ার মতবাদেরই বেশি আদর ছিল; কারণ, এই পরিকল্পনা স্বাভাবিক ও গণিতের নিয়মাধীন বলিয়া সন্তোষজনকও বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি বিখ্যাত আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাসেল ইহার বিরুদ্ধে এমন এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে এই মতবাদে সন্দিহান হইতে হয়। রাসেল বল-বিজ্ঞানের হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই মতবাদ সত্য হইলে আগন্তুক নক্ষত্রটিকে নিশ্চয়ই সূর্যের অতি নিকটে আসিতে হইয়াছিল। সেক্ষেত্রে আগন্তুক নক্ষত্রটিরই এত ঘূর্ণিভরবেগ থাকিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না যে, গ্রহগুলির বর্তমান ঘূর্ণিবেগ তাহাদিগকে চালনা করিতে পারে। যদি সত্যসত্যই সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন অংশগুলিতে আগন্তুক নক্ষত্রটি এই গতিবেগ চালনা করিত তাহা হইলে সে অবস্থায় গ্রহগুলি এত অধিক গতিবেগের

অধিকারী হইত যে, তাহারা সূর্যের আকর্ষণ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া মহাশূন্যে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইত। এই সমস্যার এখন পর্যন্ত কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে আর. এ. লিট্‌ল্‌টন সৌরজগতের উৎপত্তির এমন একটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, যাহার বিরুদ্ধে রাসেলের যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না। লিট্‌ল্‌টনের মতে আদিমকালে সূর্যের একটি সঙ্গী ছিল। ইহারা উভয়ে মিলিয়া যুগলতারারূপে আকাশে পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিত। এইরূপ যুগলতারা আকাশে বহু দেখা যায়। লিট্‌ল্‌টন বলেন, বস্তুত সূর্যের সহিত কোনো আগন্তুক নক্ষত্রের সাক্ষাৎ হয় নাই কিন্তু এইরূপ একটি নক্ষত্রের একসময় সূর্যের সঙ্গীটির সহিত সংঘর্ষণ হয়। ফলে বিলিয়ার্ড বলের ন্যায় দুইটি নক্ষত্র বিভিন্ন দিকে ছুটিয়া চলিয়া যায়। সূর্য একা তাহার পূর্বস্থলে পড়িয়া থাকে। সংঘর্ষণকালে নক্ষত্র দুইটি হইতে দড়ির ন্যায় এক অংশ আকাশে উত্থিত হয়। এই উত্থিত অংশের দুই পার্শ্ব নক্ষত্র দুইটির সহিত শূন্যে অন্তর্হিত হয়। মধ্যের অংশ নক্ষত্র দুইটি হইতে দূরে থাকার জন্য তাহাদের আকর্ষণের বশীভূত না হইয়া সূর্যের নিকটেই থাকিয়া যায়। ক্রমে এই অংশ ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হইয়া গ্রহে পরিণত হয় এবং সূর্যের আকর্ষণে তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করে। এই মতবাদ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক এখনও চলিতেছে। মোটকথা, সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রচলিত থাকিলেও এই জটিল প্রশ্নের সন্তোষজনক কোনো মীমাংসা হইয়াছে, একথা বলা যায় না।

এই সূত্রে একটি কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়— সৌর-জগতের ন্যায় আরও গ্রহবেষ্টিত নক্ষত্র আকাশে আছে কি না। এই প্রশ্নের সহজ উত্তর দেওয়ার অন্তরায় এই যে, নক্ষত্রগুলি এতদূরে যে, তাহাদের কোনো গ্রহ থাকিলেও দূরবীক্ষণযন্ত্রে তাহা ধরা পড়ার সম্ভাবনা অতি কম। এযাবৎ এইরূপ গ্রহবেষ্টিত নক্ষত্রজগতের কোনো নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায় নাই।* কিন্তু গত কয়েক বৎসরে

আকাশে "নক্ষত্রশিকার" করিতে করিতে কোনো কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী এমন দুইটি নক্ষত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, যাহারা গ্রহবেষ্টিত বলিয়া সন্দেহ হয়। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্ট্র্যাণ্ড নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ৬১ বলাকামণ্ডলে (61 Cygni) দুইটি যুগল তারার সন্ধান পান। তাহাদের ভর প্রায় সমান এবং সূর্যের ভরের অর্ধেক। তারা দুটি এত দূরে যে, তাহাদের আলো প্রায় এগারো বৎসরে পৃথিবীতে পৌঁছায়। ইহাদের গতির হিসাব ও পর্যবেক্ষণের ফলে কিছু গরমিল দেখা যায়। যদি ধরা যায় যে, তাহাদের নিকটে একটি জড়পিণ্ড আছে যাহার ভর সূর্যের ভরের ১/৬০ ভাগ, তাহা হইলে বল-বিজ্ঞানের হিসাবে আর কোনো গরমিল থাকে না। ইহা হইতে মনে হয়, এই নক্ষত্র দুইটির মধ্যে যে কোনো একটির সূর্যের ১/৬০ ওজনের অর্থাৎ বৃহস্পতির ছয়গুণ ওজনের একটি গ্রহ আছে। আকারে ছোটো বলিয়া তাহার আলো দেখা যায় না, কিন্তু জড়-আকর্ষণের ফল দেখিয়া তাহার অস্তিত্ব জানা যায়। এই প্রকার বৃহস্পতির কয়েক গুণ বড়ো আর-একটি গ্রহ ৭০ ওফায়াকৃস (70 ophiuchi) মণ্ডলে একটি যুগলতারার নিকটবর্তী স্থানে আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। কিছুকাল পূর্বে বিজ্ঞানী জীন্‌স বলিয়াছিলেন, সৌরজগৎ বিশ্বে এক অতি আকস্মিক ও দুর্লভ ঘটনা। একথা এখন আর জোর করিয়া বলা চলে না।

গ্রহের বায়ুমণ্ডল

যদি একদিন খবরের কাগজের এক কোণে এই সংবাদ বাহির হয় যে, কোনো বিজ্ঞানী বহুদিন পরীক্ষার পর স্থির করিতে পারিয়াছেন যে, মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে অক্‌সিজেন গ্যাস নাই, থাকিলেও যৎকিঞ্চিৎ আছে— তাহা হইলে অনেকেই ইহাকে একটি অতি আজগুবী সংবাদ বলিয়া মনে করিবেন। সত্য কথা বলিতে গেলে এইরূপ একটি সংবাদে আমাদের সাধারণ জ্ঞান একটু বাড়িতে

পারে, কিন্তু পৃথিবীর বাহিরে আমাদের প্রতিবেশীদের যদি আদৌ কেহ থাকে— তাহাদের বাতাসে কি আছে না-আছে তাহার খবরে আমাদের কোনোই প্রয়োজন নাই, এমন কি এই প্রকার জ্ঞানলাভের চেষ্টারও প্রয়োজন কি, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু বিজ্ঞানীরা গ্রহউপগ্রহের বাতাসে কি আছে ও নাই তাহার অনুসন্ধান করিয়া সৌরজগৎসৃষ্টি-সম্বন্ধে যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, তাহা মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে স্থান পাইবার যোগ্য।

প্রথমত আমরা মনে রাখিব যে, আকাশের তারাগুলিকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলেই একই প্রকার পদার্থ দ্বারা গঠিত। আলোকের বর্ণবিশ্লেষণ দ্বারা এই সঠিক খবরটি আমাদের মিলিয়াছে। পৃথিবীতে যে সকল মৌলিক পদার্থ দেখা যায় সূর্যেও তাহাদের অধিকাংশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং অন্যান্য তারাতেও এইগুলিই দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য ও সমুদয় তারাতে হাইড্রোজেনের পরিমাণই অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা অনেক বেশি, তাহার পর ক্রমান্বয়ে বলা যাইতে পারে— হিলিয়াম, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, অঙ্গার, সিলিকন ও অন্যান্য ধাতুর পরিমাণ। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন এই সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহগুলির সৌরদেহের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে কোনো উপায়ে সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এইগুলিতে সূর্যের উপরক্তি উপাদানগুলিরই অধিকাংশ থাকিবার কথা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সূর্যদেহের অংশ যখন বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তাহা অতি উত্তপ্ত গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল এবং গ্রহউপগ্রহগুলি সৃষ্টি হওয়ার পর ইহারা প্রথমে উত্তপ্ত গ্যাসীয়, তাহার পর উষ্ণ তরল ও অবশেষে শীতল ও কঠিন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। এই তিন অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে ইহাদের বায়ুমণ্ডলে যে-রূপান্তর হওয়ার কথা— তাহা আমরা এখন আলোচনা করিব।

সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে— ছোটো, মাঝারি ও বড়ো। সমুদয় উপগ্রহ ও সবচেয়ে ছোটো গ্রহ বুধ ছোটোর দলে। ইহাদের ভর কম এবং প্রায় সকলগুলির
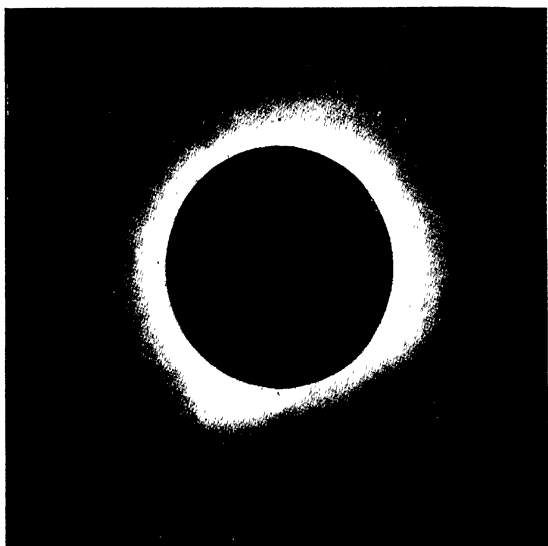
চিত্র ১৪ — করোনা। বর্ণমণ্ডলের বাহিরে সূর্যের যে অংশ তাহার নাম করোনা। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যপৃষ্ঠ সম্পূর্ণ আবৃত হইলে করোনা সুন্দররূপে দেখা যায়। ১৯২২ সালের ২১এ সেপ্টেম্বর সূর্যগ্রহণের সময় অস্ট্রেলিয়াতে এই আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়।
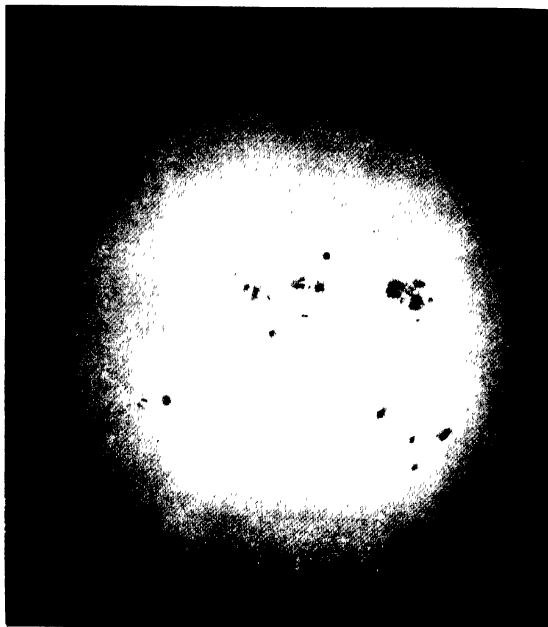
কোনোই বায়ুমণ্ডল নাই, মাত্র খুব বড়োগুলির, যেমন বুধগ্রহের ও প্রায় তাহারই মতো বড়ো ইউরেনাস ও নেপচুনের দুইটি চন্দ্রের অতিশয় লঘু সামান্য বায়ুমণ্ডল থাকিতে পারে। পৃথিবী মঙ্গল ও শুক্র মাঝারি শ্রেণীতে পড়ে। ইহারা প্রথম শ্রেণীর গ্রহ-উপগ্রহ-গুলির অপেক্ষা ওজনে বেশি ভারী এবং ইহাদের বায়ুমণ্ডল আছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর অক্‌সিজেন ও নাইট্রোজেন আছে, অল্প কার্বন-ডাইঅক্সাইডও ইহাতে আছে এবং অতি সামান্য হিলিয়ামও ইহাতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু মোটেই কোনো হাইড্রোজেন পাওয়া যায় নাই। বায়ুমণ্ডলের সহিত কার্বন-ডাইঅক্‌সাইড ও অক্‌সিজেনের একটা আদানপ্রদান উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সাহায্যে চলিতেছে। উদ্ভিদ্‌গুলি বায়ু হইতে কার্বন-ডাইঅক্সাইড টানিয়া লয় এবং ইহার উপাদান অঙ্গারটিকে নিজের দেহপুষ্টির জন্য রাখিয়া অক্‌সিজেনকে বায়ুমণ্ডলে ফিরাইয়া দেয়। প্রাণীগুলি আবার বায়ু হইতে অক্‌সিজেন নিজদেহের জন্য ব্যবহার করিয়া কার্বিন-ডাইঅক্সাইড ও কিছু জলীয় বাষ্প বাতাসে ছাড়িয়া দেয়। যে-গ্রহে উদ্ভিদ্ আছে, তাহার বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিশ্চয়ই থাকিবে, এবং যাহাতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়ই আছে তাহার বায়ুমণ্ডলে অক্‌সিজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড্ উভয়েরই থাকার কথা। পৃথিবীর মত মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের প্রত্যেকেরই একটি বায়ুমণ্ডল আছে। এই দুই গ্রহেই জল ও জলীয় বাষ্পের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রচুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে, কিন্তু মঙ্গল ও শুক্রের বায়ুমণ্ডলে অক্‌সিজেনের কোনো আভাস পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অক্‌সিজেন থাকা অসম্ভব নয়, থাকিলেও পরিমাণে নিশ্চয়ই খুব কম।

তৃতীয় শ্রেণীতে কেবল সৌরজগতের বড়ো গ্রহগুলি আছে, যেমন— বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। ওজনে এইগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রহ অপেক্ষা অনেক বেশি ভারী এবং সূর্য হইতে বেশি দূরবর্তী হওয়াতে ইহারা খুব শীতল। এই শৈত্যের পরিমাণ দূরত্ব অনুসারে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুনে ক্রমাগত বাড়িয়া গিয়াছে।

লাওয়েল মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্লিফার বহু পরীক্ষার পর

আবিষ্কার করেন যে, এই চারিটি বড়ো গ্রহের বর্ণালীতে লাল ও লাল-পারে একই প্রকার পটিবর্ণালী (band spectrum) দেখা যায় এবং এই পটি বৃহস্পতি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য তিনটি বড়ো গ্রহের ক্ষেত্রে ক্রমশ অধিক পরিস্ফুট। কোনো গ্যাসের অণু (molecule) হইতে এই পটিবর্ণালীগুলির জন্ম। কয়েক বৎসর পরে জর্মান (সম্প্রতি আমেরিকান) জ্যোতির্বিজ্ঞানী ভিলট্ (Wildt) এই গ্যাসকে অ্যামোনিয়া ও মিথেন্ গ্যাস বলিয়া সাব্যস্ত করেন। তাহার পর স্লিফারও তাঁহার নিজ পরীক্ষাগারে এইসকল গ্যাস চোঙায় পুরিয়া তাহাদের বর্ণালী পরীক্ষা করিয়া ভিলটের কথা সমর্থন করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে, বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে অ্যামোনিয়া গ্যাস খুব বেশি, শনিতে তাহা অপেক্ষাকৃত কম, এবং ইউরেনাস ও নেপচুনে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। পক্ষান্তরে মিথেন্ গ্যাস বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে কম, কিন্তু এই গ্যাসের পরিমাণ শনি ইউরেনাস্ ও নেপচুনে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানী ডান্‌হাম ইহার একটি সরল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সূর্য হইতে গ্রহগুলির দূরত্ব ক্রমশ বাড়িয়া যাওয়াতে গ্রহগুলি পর পর বেশি শীতল হইয়া আছে। অ্যামোনিয়া গ্যাস ঠাণ্ডায় জমিয়া যায়। বৃহস্পতি ঠাণ্ডা হইলেও তাহার বায়ুমণ্ডলে অনেক পরিমাণ অ্যামোনিয়া গ্যাসীয় অবস্থায় থাকিতে পারে। শনিতে বেশি ঠাণ্ডা বলিয়া তাহার বায়ুমণ্ডলের অনেক অ্যামোনিয়া তরল বিন্দু অবস্থায় মেঘের আকারে আছে। ইউরেনাস্ ও নেপচুনে এই তরল অবস্থা এত অধিকদূর পৌঁছিয়াছে যে, যেটুকু অ্যামোনিয়া গ্যাসীয় অবস্থায় আছে, তাহা হইতে পটিবর্ণালীর উৎপত্তি হইতে পারে না। এদিকে বায়ুমণ্ডলের অ্যামোনিয়া যতই তরল অবস্থায় পৌঁছায় বায়ুমণ্ডল ততই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ হয় এবং তাহার অন্য উপাদান মিথেন্ গ্যাসকে ততই বেশি স্পষ্ট দেখা যায়। বৃহস্পতি হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য গ্রহ তিনটির বায়ুমণ্ডলের ক্রমশ গভীরতর প্রদেশগুলি আমরা বর্ণালীতে দেখিতে পাই, কাজেই মিথেন্ গ্যাসও পরিমাণে আমাদের নিকট ক্রমশ বেশি বলিয়া মনে হয়।

১৯৩৫ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাসেল্ গ্রহগুলির এইসকল তথ্য সংগ্রহ

করিয়া তাহাদের বায়ুমণ্ডলের ক্রমবিকাশের একটি সুন্দর পরিকল্পনা করেন। তিনি বলেন যে, প্রথম শ্রেণীর ছোটো উপগ্রহগুলি ছোটো বলিয়া ইহাদের জড় আকর্ষণ এত কম যে, তাহাদের জন্মের সঙ্গেসঙ্গেই তাহাদের বায়ুমণ্ডল মহাকাশে পলাইয়া যায়। বৃহত্তর গ্রহ পৃথিবী তাহার বায়ুমণ্ডলকে সঙ্গে করিয়া শূন্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। বায়ুমণ্ডলের অণুগুলিরও নিজেদের যথেষ্ট গতিবেগ আছে, মোটামুটি বলা যাইতে পারে সেকেণ্ডে প্রায় ৫০০ গজ। এই বেগে অতি সামান্য পথ চলিয়াই ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এত বেগে ছুটিলেও পৃথিবী প্রবল জড় আকর্ষণ দ্বারা ইহাদিগকে নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে। ছোটো উপগ্রহগুলির এইরূপ আকর্ষণ-শক্তি না থাকাতে তাহারা তাহাদের বায়ুমণ্ডল মোটেই ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। আবার গ্যাসের তাপ যত বাড়ে তাহাদের কণাগুলির ছুটাছুটির বেগও তত বাড়িতে থাকে। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে, গ্রহ যত উষ্ণ হইবে তাহার তত কমিতে থাকিবে, অন্যদিকে আবার হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের বায়ুমণ্ডলের গ্যাসও মতো হালকা গ্যাসগুলি অক্সিজেন নাইট্রোজেন ইত্যাদি অন্যান্য ভারী গ্যাসের পূর্বেই বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়া শূন্যে পলাইয়া যাইবে। এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, ছোটো উপগ্রহগুলি যখন গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল তখনই তাহারা তাহাদের বায়ুমণ্ডলগুলি হারাইয়াছে। বুধগ্রহ ও চন্দ্রের মতো বড়ো উপগ্রহগুলি কঠিন অবস্থায় পৌছানো পর্যন্ত তাহাদের বায়ুমণ্ডলের অংশ কিছু ধরিয়া রাখিতে সম্ভবত সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে এই সামান্য অংশের অস্তিত্বও প্রায় লোপ পাইয়াছে।

পৃথিবী, শুক্র ও মঙ্গল এই মধ্যমশ্রেণীর গ্রহগুলি যখন উষ্ণ তরল-অবস্থায় ছিল তখনই ইহাদের বায়ুমণ্ডলের লঘু উপাদান হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস নিশ্চয়ই শূন্যে পলাইয়া যায়, কিন্তু এই লঘু গ্যাসের যে অংশ অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া যৌগিক অবস্থায় ছিল তাহা গ্রহের তরলদেহে থাকিয়া যায়। ভারী অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসও কিছু কিছু পলাইতে থাকে কিন্তু গ্রহগুলি ক্রমশ শীতল অবস্থায় পৌছিবার সঙ্গেসঙ্গেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। অক্সিজেন কিন্তু ধাতব

পদার্থের বর্তমানে পূর্ণ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকিতে পারে না। ইহা ধাতু ও অন্যান্য পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া নানাপ্রকার অক্সাইডরূপে তরল গ্রহপিণ্ডে প্রবেশ করে। অক্সিজেনের এক অংশ অঙ্গারের সহিত যুক্ত হইয়া কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সৃষ্টি করে। সুতরাং এই গ্রহগুলির প্রত্যেকটিরই তরল-উষ্ণ-অবস্থায় নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইডের একটি বায়ুমণ্ডল ছিল। গ্রহপিণ্ড ক্রমশ শীতল হইলে তাহা হইতে আবার উষ্ণ জলীয় বাষ্প ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাহির হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিতে থাকে, এবং ক্রমে এই বায়ুমণ্ডল নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পে পূর্ণ হইয়া যায়। পরে গ্রহের উপরিভাগ বেশ শীতল হইলে জলীয় বাষ্প জলে পরিণত হইয়া গ্রহের সমুদয় নীচু জায়গায় হ্রদ, সাগর ও মহাসাগরের সৃষ্টি করে। কাজেই ইহাদের বায়ুমণ্ডলে তখন কেবলমাত্র নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড অবশিষ্ট থাকে। শুক্রের বায়ুমণ্ডলে এখনও যথেষ্ট কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও সামান্য আছে। কিন্তু আমাদের বায়ুমণ্ডলে এত অক্সিজেন কোথা হইতে আসিল? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। কোনো গ্রহের বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড না থাকিলে তাহাতে উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে না। মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদ্ আছে একথা অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীই বিশ্বাস করেন। আবার প্রাণীর জন্য অক্সিজেন দরকার। কাজেই মনে হয় পৃথিবীতে প্রথম উদ্ভিদেরই আবির্ভাব হইয়াছিল। এই উদ্ভিদ্ বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাইঅক্সাইড টানিয়া লইয়া ইহাতে অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয় এবং কালক্রমে বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাইঅক্সাইড কমাইয়া ইহাকে প্রচুর অক্সিজেন-গ্যাসে পূর্ণ করিয়া তোলে। তখন পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব হয়। এই প্রাণী আবার বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন টানিয়া তাহাতে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ছাড়িয়া দেয়। এইরূপে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর ক্রিয়ার ফলে ক্রমে এমন অবস্থায় পৌঁছান গিয়াছে যে, বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অনুপাত স্থির হইয়া আছে। এই অনুপাতই প্রাণী ও উদ্ভিদ্জগতের পক্ষে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বেশি উপযোগী।

এই পরিকল্পনা অনুসারে বলিতে হইবে, শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রচুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড কিন্তু অতি সামান্য পরিমাণ অকসিজেন কিংবা একেবারে অক্সিজেন না-থাকার অর্থ এই যে, এই গ্রহটি ক্রমবিকাশের ধারায় পৃথিবীর অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। শুক্রগ্রহে উদ্ভিদ্‌যুগ মোটেই আরম্ভ হয় নাই কিংবা সবেমাত্র হইয়াছে। এই গ্রহ এখনও জীবের বাসের যোগ্য হইয়া উঠে নাই। মঙ্গলগ্রহের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে, ইহাতে হয়তো সামান্য মাত্র অক্‌সিজেন আছে, কিন্তু প্রচুর কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অস্তিত্ব ইহাতে পাওয়া যায় না। কিছু উদ্ভিদ্ ও জল যে ইহাতে আছে দূরবীক্ষণ-যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষার ফলে অনেকের এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে। সুতরাং মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে শুক্রের ন্যায় প্রচুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড কিংবা পৃথিবীর ন্যায় প্রচুর অক্‌সিজেন নাই। উদ্ভিদের জন্য বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাইঅক্সাইড কমিতে পারে কিন্তু অক্‌সিজেন কোথায় গেল? জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাসেল্ বলেন, মঙ্গলের ঐ যে লাল রং তাহার কারণ এই যে, তাহার বায়ুমণ্ডলের অক্‌সিজেন ক্রমে তাহার শিলায় প্রবেশ করিয়াছে। লৌহজাত ফেরাস্-অক্সাইড ক্রমে ফেরিক-অক্সাইডে পরিণত হইয়াছে। এই অক্সাইডের জন্যই মঙ্গলের জ্যোতি এত লাল। প্রাণী যে অক্‌সিজেন বাতাস হইতে গ্রহণ করে তাহা সে আবার কার্বন-ডাইঅক্সাইডের মধ্য দিয়া বাতাসে ফিরাইয়া দেয় কিন্তু যে অক্‌সিজেন শিলায় প্রবেশ করে তাহা আর বাতাসে ফিরিয়া আসে না, ফলে প্রাণীজগতের ধ্বংস হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অকসিজেনও মনে হয় ক্রমশ শিলায় প্রবেশ করিবে, তখন পৃথিবীও প্রাণীর বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং বলিতে হইবে মঙ্গলগ্রহ এখন উদ্ভিদ্ ও প্রাণী ধারণের অবস্থা প্রায় অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীও যে এককালে এই অবস্থায় পৌঁছিবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ এখনও দেখা যায় না।

তৃতীয় শ্রেণীর গ্রহগুলি এত বড়ো যে, তাহাদের জন্মকাল হইতে এ পর্যন্ত কোনো গ্যাসই তাহাদের আকর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া শূন্যে পলাইতে পারে নাই। এমনকি সমস্ত হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামকেও এই গ্রহগুলি

ধরিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ গ্রহের বায়ুমণ্ডলের এক হাজার ডিগ্রি উষ্ণ অবস্থায় ইহাতে থাকিবে নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, প্রচুর হাইড্রোজেন ও কিছু হিলিয়াম। অক্সিজেন গ্যাসীয় অবস্থায় থাকিতে পারিবে না, অধিক পরিমাণে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয়-বাষ্পে যৌগিক অবস্থায় থাকিবে। গ্রহগুলি আরও শীতল হইলে রাসায়নিক নিয়মে এই মসলাগুলির কিছু রূপান্তর ঘটিবে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোজেনের যোগে মিথেন গ্যাস ও জলীয় বাষ্প এবং নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন মিলিয়া অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি হইবে। প্রায় পৃথিবীর মত ঠাণ্ডা হইতে হইতে ইহাদের বায়ুমণ্ডলে থাকিবে অ্যামোনিয়া, মিথেন গ্যাস, হাইড্রোজেন ও কিছু হিলিয়াম। বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প হইতে প্রথমত সাগর মহাসাগরের জন্ম হইবে। ক্রমে গ্রহগুলি আরও অনেক বেশি ঠাণ্ডা হইলে এই সাগর মহাসাগর জমিয়া বরফ হইবে, তাহার পর অ্যামোনিয়া গ্যাস জমিতে আরম্ভ করিবে। বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের বায়ুমণ্ডলের অ্যামোনিয়ার এক অংশ এখনও গ্যাসীয় অবস্থায় আছে, আর ইউরেনাস্ ও নেপচুন্ এই দুই গ্রহে এই অ্যামোনিয়া সম্পূর্ণ তরল হইয়া বায়ুমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বড়ো গ্রহগুলির আলোক বিশ্লেষণ করিয়া গ্রহগুলিতে উপরোক্ত গ্যাসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ধরা যাইতে পারে বৃহস্পতি ও শনিতে তরল অ্যামোনিয়া সমুদ্র ও অন্য দুইটি বড়ো গ্রহে এই সমুদ্র কিছু কিছু জমাট বাঁধিয়া আছে। কিন্তু গ্যাসীয় অবস্থায় অক্সিজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড কোনো বড়ো গ্রহের বায়ুমণ্ডলে নাই, সুতরাং এই গ্রহগুলি প্রাণী ও উদ্ভিদ্ ধারণের পক্ষে মোটেই উপযোগী নহে এবং কখনও হইতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না।

কাজেই দেখা যাইতেছে কেবলমাত্র মাঝারি রকমের গ্রহগুলিই প্রাণী ও উদ্ভিদ্ ধারণের উপযোগী হইতে পারে। প্রাণীর জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন, কিন্তু বায়ুমণ্ডলে গ্যাসীয় অক্সিজেনের উৎপত্তির কোনো রাসায়নিক কারণ দেখা যায় না। এক সম্ভাবনা এই যে, উদ্ভিদজগৎই সম্ভবত কার্বন-ডাইঅক্সাইড হইতে অক্সিজেন তৈয়ারী করিয়া ভবিষ্যতে

প্রাণীজগতের আবির্ভাবের রাস্তা খুলিয়া দিয়াছে। উদ্ভিদের সহিত আমাদের এ সম্বন্ধের সম্ভাবনার কথা আমরা কি পূর্বে কখনও চিন্তা করিয়াছি ?

সূর্য

শীতকালের ভোরবেলা গায়ে একটু রোদ লাগানো বেশ আরামপ্রদ। চিকিৎসকগণ অনেক রোগীকে 'সূর্যের আলোতে স্নানের' ব্যবস্থা দেন। রাত্রির অন্ধকারের পর দিনের আলো মানুষের মনে ভরসা ও আশার সঞ্চার করে। সূর্যালোকের সহিত আনন্দ আর তাহার অভাব অন্ধকারের সহিত বিষাদ যেন জড়িত আছে। এ সত্ত্বেও সূর্য আমাদের কত বড়ো বন্ধু তাহা সাধারণ লোকে মোটেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পুরাকাল হইতে সর্বদেশে মানুষ সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর সর্বশক্তির আকর এবং সর্বজীবের প্রাণ-পোষণকারী বলিয়া এই পূজা ভাস্করদেবের নিশ্চয়ই প্রাপ্য। পৃথিবীর যে-কোনো শক্তির যে-কোনো রূপে আমরা পরিচয় পাই তাহার মূলে আছে সূর্যের তাপ। কয়লা পোড়াইয়া যে তাপশক্তি বাষ্পশক্তি কিংবা তড়িৎশক্তি পাওয়া যায় তাহার সকলগুলিই কয়লাতে নিহিত সূর্যতাপশক্তি হইতে উদ্ভূত। কাঠ পোড়াইয়া যে তাপশক্তি পাওয়া যায় তাহার মূলেও এই সূর্যতাপশক্তি। গাছ সূর্যের আলোর সাহায্যে বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড হইতে অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া নিজেদের দেহ পুষ্ট করে। এই অঙ্গারই পরে অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইবার কালে আগুন সৃষ্টি করে। আগুন ব্যতীত বর্তমান জীবন-সম্ভাবনা কল্পনাও করা যায় না। বৃষ্টির জল শস্যের জন্য প্রয়োজনীয়। মানুষের বসবাস ও সভ্যতার বিকাশ চিরকালই কোনো নদী কিংবা সমুদ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহার সবই আবার আমরা সূর্যের প্রসাদে পাইয়া থাকি। সূর্যতাপে প্রথমত সমুদ্র ও জলাশয় হইতে মেঘ উত্থিত হয়, অপর দিকে পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান সূর্যকিরণদ্বারা বিভিন্ন পরিমাণে উত্তপ্ত হওয়ায় বায়ুচলাচলের সৃষ্টি হয়। এই বায়ু প্রবাহিত হইয়া দেশমধ্যে

মেঘ ও জলীয়বাষ্প বহন করিয়া লইয়া যায়। মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত ও নদীর জল সরবরাহ হয়। সূর্যতাপের অভাবে সাগর মহাসাগর ও সমুদয় জলরাশি কঠিন বরফের অবস্থা প্রাপ্ত হইত। সুতরাং সূর্য ব্যতীত জীবের প্রাণধারণ অসম্ভব।

প্রাচীনকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবী স্থির হইয়া আছে এবং চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র প্রভৃতি সমুদয় জ্যোতিষ্ক তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহাই দৃশ্যমান প্রকৃতির রূপ, একথা সত্য। কিন্তু এ বিশ্বাসের মূলে মানুষের এই অহংকারও ছিল যে, মানুষই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব। সুতরাং আকাশের সকল জ্যোতিষ্ক অনুচরের ন্যায় তাহার পরিচর্যায় নিরত এবং তাহার বাসস্থান পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করাই তাহাদের ধর্ম। গ্রীক পণ্ডিত এরিস্টটল্ ও টলেমি এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। মধ্যযুগের খ্রীস্টীয় ধর্ম-যাজকগণও ধর্মমন্দির হইতে এই কথা প্রচার করিতেন, এবং ইহার প্রতিবাদ সহ্য করিতেন না। খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতকে পোল্যাণ্ডদেশীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস্ প্রথম বলেন যে, সূর্যই আকাশে স্থির হইয়া আছে এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি তাহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ইহার অনুকূলে কোপার্নিকাসের প্রধান যুক্তি ছিল যে, এই পরিকল্পনাদ্বারা আকাশে সূর্য ও সকল গ্রহের গতি অতি সহজে উপলব্ধি করা যায়। সে যুগে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র ছিল না সুতরাং সৌরকেন্দ্রীয় গতির চাক্ষুষ প্রমাণের কোনো উপায়ও ছিল না। কোপার্নিকাস্ তাঁহার সে ধর্মবিরুদ্ধ মত বহু দ্বিধার পর পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পুস্তকটি তাঁহার মৃত্যুসময়ের বিশেষ পূর্বে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। মৃত্যুশয্যায় এই পুস্তক প্রথম তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হয়। মৃত্যুর সাহায্যে তিনি ধর্ম্মযাজকদের রোষ হইতে নিস্তার পাইলেন। কোপার্নিকাসের এক প্রিয় বন্ধু তাঁহার উপকারার্থে পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়া দিয়াছিলেন, যে, পুস্তকের সকল বিষয়ই গ্রন্থকারের কল্পনাপ্রসূত সুতরাং তাহার সত্যাসত্যের দাবী তিনি করেন না। হায় কোপার্নিকাস! যে সত্য প্রচারের জন্য তিনি মৃত্যুপণ করিলেন তাহাকে কল্পনাবিলাসী অলস মস্তিষ্কের স্বপ্ন বলিয়া

রক্ষা করিতে হইল। সেদিন কিন্তু ধর্মযাজকের রোষনেত্রেও হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর ইতালীয় পণ্ডিত গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ-যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেখাইলেন যে, আকাশের অন্য গ্রহেরও উপগ্রহ আছে যাহারা গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে। গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের মতবাদ সমর্থন করেন। ফলে জীবনের শেষাংশে তিনি অশেষ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হন। মৃত্যুভয় দেখাইয়া ধর্মযাজকমণ্ডলী তাঁহার মুখ হইতে স্বীকার করাইয়া লইলেন যে, তিনি ভ্রান্ত। আজ একথা সর্ববাদীসম্মত যে, কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিওর আবিষ্কারই জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতির প্রথম সোপান। সূর্যকে সৌর-জগতের কেন্দ্র বলিয়া স্বীকার করা হইতেই বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞান আরম্ভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

গ্রহউপগ্রহগুলির তুলনায় সূর্য অতি বিশাল। ইহার ব্যাস ৮৬৪ হাজার মাইল এবং দেহ তেরো লক্ষ পৃথিবীর দেহের সমান। সূর্যকে তুলিয়া লইয়া তাহার কেন্দ্র যদি পৃথিবীর কেন্দ্রে স্থাপন করা যাইত তাহা হইলে চন্দ্র ও তাহার সম্পূর্ণ কক্ষটি তো সূর্যের মধ্যে থাকিতই অধিকন্তু সূর্যদেহ এই কক্ষের বাহিরেও প্রায় দুই লক্ষ মাইল বিস্তৃত হইয়া থাকিত। সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের সওয়া-তিন-লক্ষ গুণেরও বেশি। এই বিশাল ভরের জড়আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা সূর্য সমুদয় গ্রহ-উপগ্রহকে তাহাদের নিজ নিজ পথে ধরিয়া রাখিয়াছে।

সূর্যকে চন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সূর্য পূর্ণচন্দ্র অপেক্ষা সাড়ে-চার-লক্ষ গুণেরও অধিক উজ্জ্বল। সূর্য হইতে কি পরিমাণ তাপ আমরা পাই তাহা অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করিয়া হিসাব করা হইয়াছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটার ক্ষেত্র প্রতি মিনিটে ১·৯৪ (প্রায় দুই) ক্যালরি পরিমাণ তাপ সূর্য হইতে পায়। এক গ্রাম (এক সেরের প্রায় এক হাজার ভাগের এক ভাগ) জলকে এক ডিগ্রি উত্তপ্ত করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাহাকে এক ক্যালরি বলে। হিসাব করিলে দেখা যায় যে, প্রতি মিনিটে সূর্যের উপরিতলের প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটার ক্ষেত্র ঐ

তাপের পঁয়তাল্লিশ হাজার গুণ বেশি তাপ বিকিরণ করে। পৃথিবীর এক বর্গমাইল জমির উপর যে সূর্যরশ্মিপাত হয় তাহা প্রায় ৪৭ লক্ষ অশ্বশক্তির সমান! কিন্তু সমুদয় সূর্যতাপের অতি ক্ষুদ্র অংশ আমরা পৃথিবীতে পাই, অধিকাংশই শূন্যে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া যায়। এই সূর্যতাপের অংশের পরিমাণ হইতে হিসাব করা হইয়াছে যে, সূর্যের উপরিতলের তাপমাত্রা প্রায় ছয় হাজার ডিগ্রি। এই সূত্রে বলা যাইতে পারে যে, একটি জ্বলন্ত স্টোভের তাপমাত্রা প্রায় পাঁচ শত ডিগ্রি এবং একটি ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের ভিতরের জ্বলন্ত তারের তাপমাত্রা প্রায় দুই হাজার ডিগ্রি।

ঐতিহাসিকযুগের মধ্যে সূর্যতাপের কোনো বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই, এমনকি গত কয়েক কোটি বৎসরের মধ্যেও তাহার তাপের তারতম্যের কোনো আভাস পাওয়া যায় না। প্রাগ্‌ক্যাম্‌ব্রিয়ান যুগের শিলাস্তরে ঐ যুগের প্রাণীর যেসকল কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া জীবের ক্রমবিকাশের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা যায়। তখন হইতে বর্তমান সময়ের মধ্যে সূর্যতাপের বিশেষ পরিবর্তন হইলে এই ক্রমবিকাশের ধারা অকস্মাৎ মধ্যাবস্থায় লোপ পাইত। সূর্যতাপশক্তি যদি বর্তমান তাপশক্তির অর্ধেক হয় তাহা হইলে পৃথিবীপৃষ্ঠের সমুদয় তরল পদার্থ জমিয়া যাইবে। পক্ষান্তরে এই তাপশক্তি কয়েকগুণ মাত্র বেশি হইলেই সমুদয় সাগর-মহাসাগর টগবগ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিবে।

সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ছয় হাজার ডিগ্রি বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এইরূপ— সূর্যের মতো বড়ো এমন-একটি পদার্থ কল্পনা করা হউক যাহার দেহের এই গুণ যে, তাহাতে যে রশ্মি পড়ে তাহার সমস্তই তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকে, কোনো অংশ প্রতিফলিত হইয়া কিংবা অন্য কোনো উপায়ে এই পদার্থ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় না। এইরূপ একটি বস্তু প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক; বিজ্ঞানীরা ইহাকে বলেন 'কৃষ্ণপদার্থ' (black body)। কাল্পনিক হইলেও এইরূপ একটি উত্তপ্ত বস্তু হইতে যে তাপ বিকীর্ণ হয় তাহার নিয়ম বিজ্ঞানীদের নিখুঁতভাবে জানা আছে। এইরূপ একটি বস্তুর তাপ-বিকিরণশক্তির সহিত সাধারণ বস্তুর তাপ-বিকিরণ-

শক্তির তুলনা করিয়া শেষোক্ত বস্তুর তাপ-বিকিরণশক্তির পরিমাপ করা হয়, যেমন সম-আয়তনের জলের ওজনের সহিত তুলনা করিয়া কোন্ বস্তু কত ভারী অর্থাৎ তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দেশ করা যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছয় হাজার ডিগ্রি উত্তপ্ত এইরূপ একটি কৃষ্ণপদার্থ হইতে যে তাপ বিকীর্ণ হইবে সূর্য হইতেও সেই পরিমাণ তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। সূর্যদেহের অভ্যন্তরের তাপ অনেক বেশি। গণিতের সাহায্যে গণনা করিয়া পাওয়া যায় যে, সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় দুই কোটি ডিগ্রি। সূর্যের পৃষ্ঠতল হইতে যত ভিতর দিকে যাওয়া যায় তাপমাত্রা ক্রমশ ততই বাড়িতে থাকে।

তাপমাত্রা অনুসারে সূর্যের দেহকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হইয়া থাকে। সূর্যের দিকে দেখিলে তাহাকে একটি অস্বচ্ছ গোলক বলিয়া মনে হয়। বস্তুত এই সূর্যগোলক একটি গ্যাসীয় আবরণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত। এই গ্যাসীয় আবরণের নিম্নভাগ স্বল্প স্বচ্ছ; উপর দিকে ইহা ক্রমেই অধিকতর স্বচ্ছ হইয়া অতি উর্ধ্বদেশে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এক অতি-সূক্ষ্ম গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হইয়াছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্যের গ্যাসীয় আবরণকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন। সর্বনিম্নের অংশের নাম তাপমণ্ডল। এই অংশ হইতেই আমরা সূর্যের সমুদয় তাপ ও রশ্মি পাইয়া থাকি। এই অংশ স্বল্প-স্বচ্ছ এবং নানাবিধ পদার্থের পরমাণু ও প্রচুর ইলেকট্রনদ্বারা পরিপূর্ণ। সূর্যের অভ্যন্তর হইতে যে তাপ তাপমণ্ডল নির্গত হয় তাহা ইলেকট্রন্‌গ্যাস দ্বারা প্রবলভাবে বিচ্ছুরিত হওয়ার জন্য এই অংশের স্বচ্ছতা কম। তাপমণ্ডলের বর্ণালী উজ্জ্বল ও অবিচ্ছিন্ন, ইহাতে কোনো বর্ণরেখা নাই। এইরূপ অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী অতিশয় উত্তপ্ত কঠিন, তরল কিংবা অপেক্ষাকৃত ঘন গ্যাসীয় পদার্থ হইতে নির্গত রশ্মিদ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে। পরীক্ষাগারেও এইরূপ উত্তপ্ত বস্তু হইতে অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী সৃষ্টি করা যায়। সকল দৈর্ঘের আলোকতরঙ্গই এইরূপ বর্ণালীতে বর্তমান, বস্তুত সমুদয় বর্ণের আলোর উপস্থিতি দ্বারাই এইরূপ একটি উজ্জ্বল অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। * এই

বর্ণালী হইতেই হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সূর্যের তাপমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ছয় হাজার ডিগ্রি এবং সেই স্থানের উত্তপ্ত গ্যাসের চাপ আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের প্রায় শতাংশের একাংশ।

সূর্যরশ্মি লম্বা করিয়া কাটা একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া চালাইয়া তাহার বর্ণালী পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এই বর্ণালী মোটের উপর যদিও উজ্জ্বল ও অবিচ্ছিন্ন কিন্তু ইহার গায়ে অসংখ্য কালো বর্ণরেখা আছে। জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রাউনহোফার প্রথম এইসকল বর্ণরেখা আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহারা ফ্রাউনহোফার-রেখা নামে পরিচিত। পরীক্ষাগারে প্রাপ্ত বর্ণরেখার সহিত তুলনা করিয়া জানা যায় যে, ফ্রাউনহোফার-রেখাগুলি কতকগুলি বিশেষ পদার্থের পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট। এইসকল বর্ণরেখা স্পষ্ট বলিয়া দেয় যে, সূর্যের বহিরাবরণে হাইড্রোজেন হিলিয়াম অক্সিজেন লোহ ক্যালসিয়াম ইত্যাদি পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় আছে। বস্তুত পৃথিবীতে প্রাপ্ত ৯০টি মৌলিক পদার্থের ২৯টি ব্যতীত অন্য সকলগুলির বর্ণরেখাই সূর্যের বর্ণালীতে পাওয়া গিয়াছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, বাকী ২৯টি মৌলিক পদার্থের সকলগুলিই সূর্যে আছে, কিন্তু নানা কারণে বর্ণালীতে তাহাদের বর্ণরেখার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং বলা যাইতে পারে, সূর্যদেহের উপাদান পৃথিবীর উপাদান হইতে ভিন্ন নহে।

তাপমণ্ডলের উপর দিকের অংশে দুই-একশত মাইল গভীর অপেক্ষাকৃত শীতল গ্যাসের একটি স্তর আছে বলিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। তাঁহারা ইহার নাম দিয়াছেন 'উলটানি স্তর' (reversing layer)। তাঁহাদের মতে এই স্তরই সূর্যের বর্ণালীর প্রায় সমুদয় বর্ণরেখার উৎপত্তিস্থল, ঠিক যেমন অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর উৎপত্তিস্থল নিম্নতর তাপমণ্ডল। নিম্ন তাপমণ্ডলের অধিকতর উষ্ণপদার্থ হইতে নির্গত রশ্মি এই স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে স্তরের অপেক্ষাকৃত শীতল পরমাণুগুলি ঐ রশ্মিগুলি হইতে কতকগুলি বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ শোষণ করিয়া লয়। উজ্জ্বল বর্ণালীর

গায়ে এই শোষিত-তরঙ্গস্থলে কালো বর্ণরেখা দেখা দেয়। এই কালো বর্ণরেখাগুলি হইতেই ঐ স্তরের পরমাণুগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য প্রকারেও এইসকল বর্ণরেখার উৎপত্তি সম্ভব, তাহা পরে বলা হইবে। 'উলটানি স্তরে' যে বহু মৌলিক পদার্থের পরমাণু আছে, তাহা ফ্রাউনহোফার-বর্ণরেখার পরীক্ষাদ্বারা এই প্রকারে জানা গিয়াছে। স্তরটির এই নামকরণের কারণ এই যে, ইহার মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মি প্রবাহিত হইবার কালে তাপমণ্ডলের সম্পূর্ণ উজ্জ্বল বর্ণালীটি স্থানে স্থানে বিপরীতরূপে, অর্থাৎ অনুজ্জ্বল কালো রেখারূপে দেখা দেয়।

পৃথিবীর স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডলের ন্যায় উলটানি স্তরের উপর সূর্যেরও বহুসহস্র মাইল গভীর একটি স্বচ্ছ গ্যাসীয় মণ্ডল আছে। ইহার নাম 'বর্ণমণ্ডল'। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়ে সূর্যপৃষ্ঠ ঠিক সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িলে তাহার উপরিস্থিত অনাবৃত বর্ণমণ্ডল উজ্জ্বল লাল রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠে। এই রংএর জন্যই ইহাকে বর্ণমণ্ডল বলা হয়। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়ে এই বর্ণমণ্ডল পরীক্ষার উৎকৃষ্ট সুযোগ পাওয়া যায়। এই সময়ে বর্ণমণ্ডলের আলোকচিত্র লইয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার বায়ুতে হাইড্রোজেন ও ক্যালসিয়মের পরমাণু আছে। হাইড্রোজেন হইতে নির্গত লাল রশ্মি হইতেই বর্ণমণ্ডলের এই রং হইয়া থাকে। মূল ক্যালসিয়াম অপেক্ষা আয়নিত-ক্যালসিয়াম পরমাণুই বর্ণমণ্ডলে অধিক পাওয়া যায়। মূল ক্যালসিয়াম-পরমাণুতে ২০টি ইলেকট্রন আছে। তাপ কিংবা অন্য কোনো কারণে এই পরমাণু হইতে এক কিংবা ততোধিক ইলেকট্রন অপসৃত হইতে পারে। একটি ইলেকট্রন অপসৃত হইলে পরমাণুটিকে 'একমাত্রা-আয়নিত', দুইটি অপসৃত হইলে 'দুইমাত্রা-আয়নিত' এইরূপ বলা হয়। বর্ণমণ্ডলের সাত-আট হাজার মাইল উচ্চ স্তরগুলিতেও হাইড্রোজেন ও আয়নিত-ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। এই মণ্ডলে মোটামুটি গ্যাসের চাপ অতি কম, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের দশ হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। বস্তুত বর্ণমণ্ডলের তাপমান ও চাপ নীচ হইতে উপরের দিকে ক্রমশই কমিয়া আসিয়াছে। উচ্চ

স্তরগুলিতে চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের বহু লক্ষ কিংবা কোটি অংশের এক অংশ মাত্র।

উলটানি স্তর ও বর্ণমণ্ডলের যে বিভিন্ন গভীরতা ও স্তরের কথা বলা হইয়াছে তাহা মোটেই কাল্পনিক নহে। ফ্রাউনহোফার-রেখার সবগুলি রেখাকে সমান প্রশস্ত কিংবা কালো দেখায় না। কতকগুলি রেখা দুই পার্শ্বে ঈষৎ কালো হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত গভীর কালো হইয়াছে। ইহাদিগকে 'পক্ষযুক্ত' রেখা বলা হয়। কতকগুলি ফ্রাউনহোফার-রেখা ক্ষীণ এবং কম কালো। রেখাগুলির কোন্‌গুলি কত কালো তাহার সূক্ষ্ম পরিমাপ করিয়া তাহাদের উৎপত্তিস্থল বিভিন্ন স্তরের গভীরতার একটি হিসাব করা যায়। যে বর্ণের (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের) রেখাগুলি খুব কালো সেই বর্ণের আলো আমরা সূর্যের বায়ুমণ্ডলের মাত্র উপরের স্তরগুলি হইতে পাই (চিত্র ১৬); কম কালো ও ক্ষীণ রেখার আলো ঐ বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত গভীরতর প্রদেশ হইতে আমাদের নিকট আসে। এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, বর্ণালীর গায়ে কোনো রেখা কালো বলিলে সেই স্থানীয় বর্ণের আলোর সম্পূর্ণ অভাব মনে করা ভুল হইবে। সেই বর্ণের আলোও আমরা পাইয়া থাকি, তবে কম। পার্শ্ববর্তী বর্ণের যে আলো আমরা পাই তাহা অধিকতর উজ্জ্বল বলিয়া ঐ বর্ণরেখার স্থানগুলি তুলনায় মাত্র কালো দেখায়। পক্ষযুক্ত রেখাগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন আয়নিত-ক্যালসিয়াম ও লৌহ-পরমাণুর রেখাগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সূর্যের বর্ণালী ও বর্ণরেখার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা এইরূপঃ সূর্যের বহিরাবরণের অবস্থা তাহার গভীরতম প্রদেশের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই গভীরতম প্রদেশ হইতে সূর্যরশ্মি প্রথমত তাপমণ্ডলে প্রবেশ করে। তাপমণ্ডলের উত্তপ্ত গ্যাস বহু ইলেকট্রন ও নানাবিধ আয়নিত ও অক্ষত পরমাণুতে পরিপূর্ণ। এইসকল বস্তুকণা দ্বারা তাপমণ্ডলের রশ্মি প্রবলভাবে বিচ্ছুরিত হয়; পরমাণুগুলি বহু পরিমাণে রশ্মি শোষণ করিয়া তাহার তেজ পুনরায় চতুর্দিকে রশ্মিরূপে বিকিরণ করিয়া দেয়।

ফলে সমুদয় তাপমণ্ডলকে একটি আলোকময় কুয়াসার মতো স্বল্প-স্বচ্ছ দেখায়। কুয়াসার মধ্য দিয়া আমরা যেমন বেশিদূর দেখিতে পাই না সেইরূপ তাপমণ্ডলেরও মাত্র উপরিভাগ হইতে তাহার তাপ ও রশ্মি আমাদের নিকট পৌঁছায় এবং ঐ অংশ পর্যন্তই আমরা দেখিতে পাই। তাপমণ্ডলের বর্ণালী উজ্জ্বল ও অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু এই তাপমণ্ডলের রশ্মি যখন অপেক্ষাকৃত শীতল কতকগুলি উচ্চস্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় তখন তাহার বর্ণালীর কিছু পরিবর্তন ঘটে। ঐসকল স্তরে কতকগুলি পদার্থের পরমাণু তাহাদের বিশেষ অবস্থায় আছে। এই অবস্থায় তাহারা তাপমণ্ডল-নির্গত রশ্মি হইতে কেনো বিশেষ বর্ণের (তরঙ্গদৈর্ঘ্যের) রশ্মি অংশত শোষণ করে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি প্রত্যেক পরমাণুই কোনো বিশেষ বর্ণের রশ্মি শোষণ করিবার ক্ষমতা ধারণ করে। হাইড্রোজেন পরমাণু যেসকল বর্ণের রশ্মি শোষণ করে তাহাদের একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ৪৮৬১ ($H\beta$) সংখ্যাদ্বারা সূচিত হয়। তাপমণ্ডলের অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীতে যেসকল রশ্মি আছে তাহাদের বর্ণ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ধারাবাহিক সমুদয় সংখ্যাদ্বারা সূচিত হইবে। এইসকল রশ্মির মধ্যে ৪৮৬১ বর্ণের যেসকল রশ্মি হাইড্রোজেন পরমাণুতে পতিত হইবে তাহা আংশিকভাবে এই পরমাণু দ্বারা শোষিত হইবে। সুতরাং অবিচ্ছিন্ন উজ্জ্বল বর্ণালীর ৪৮৬১ বর্ণস্থানের উজ্জ্বলতা কমিয়া যাইবে এবং উজ্জ্বল বর্ণালীর গায়ে এই স্বল্প-উজ্জ্বল স্থানে একটি কালো রেখার আবির্ভাব হইবে। বস্তুত এই রেখার উৎপত্তির একটি জটিলতর কারণ এই যে, উক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রশ্মি শোষণ করিয়া পুনরায় সেই পরিমাণ তেজ চতুর্দিকে বিকিরণ করিয়া দেয়। কোনো কোনো স্থলে পরমাণুটি যে বর্ণের রশ্মি শোষণ করে কেবল ঠিক সেই বর্ণের রশ্মিই বিকিরণ করে। পরমাণু যে রশ্মিটি শোষণ করে তাহা ভিতর হইতে বাহিরের দিকে প্রবহমান, কিন্তু বিকিরণ করিবার কালে সেই পরিমাণ তেজ পরমাণুটি সম্মুখে পিছনে, বস্তুত ইহার চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেয়। এই বিকীর্ণ তেজের সম্মুখের অংশমাত্র বাহিরের দিকে প্রবাহিত হয়। কোনো বর্ণের

রশ্মি শোষিত হইবার কালে বহু ক্ষেত্রেই এই অবস্থা ঘটে। ফলে যে রশ্মি পরিশেষে সূর্যপৃষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমাদের নিকট পৌঁছায় তাহার অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীতে ঐ বর্ণের রশ্মি অতি ক্ষীণ-জ্যোতি হয়, এবং বর্ণালীর গায়ে ঐ বর্ণের তরঙ্গস্থানে একটি কালো রেখা দেখা দেয়। পক্ষযুক্ত রেখার মধ্যস্থল খুব কালো; ইহার দুই পার্শ্ব ক্রমশ হালকা হইয়া উজ্জ্বল বর্ণালীর সহিত মিশিয়া যায়। মধ্যস্থলে রশ্মিতেজ সর্বাপেক্ষা কম, কারণ সেই বর্ণের রশ্মিই পথে অধিক পরিমাণে শোষিত কিংবা চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সূর্যের বহিরাবরণের গভীরতম প্রদেশের এই বর্ণের রশ্মিগুলি শোষিত কিংবা বিচ্ছুরিত হইবার দরুন মোটেই আমাদের নিকট পৌঁছায় নাই, তাহার উচ্চতম স্তরের ঐ রশ্মিগুলিমাত্র পক্ষযুক্ত রেখার মধ্যস্থল রচনা করিয়াছে। পক্ষদুইটি কিন্তু বহিরাবরণের নিম্নতর প্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত আলোকরশ্মি দ্বারাও সৃষ্ট হয়। পক্ষযুক্ত রেখার কোনো স্থলে সূর্যের বহিরাবরণের কোন্ স্তরের রশ্মি পৌঁছায় তাহা গণনা করিয়া বলা সম্ভব।

সূর্যের বর্ণমণ্ডল হইতে সময়ে সময়ে উত্তপ্ত গ্যাস বহির্দিকে নিষ্ক্রান্ত হয়। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়ে সূর্যদেহের প্রান্ত হইতে গাঢ় লাল রঙের এইরূপ গ্যাসকুণ্ডলীকে মেঘের মতো উপরদিকে উঠিতে দেখা যায়। ইহারা 'সৌরস্ফীতি' (solar prominence) নামে পরিচিত। এই স্ফীতিগুলি বর্ণমণ্ডলেরই অংশবিশেষ। নৈসর্গিক কারণে সৌর-দেহের অভ্যন্তর হইতে ইহারা উৎক্ষিপ্ত হয়।

সূর্যের বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ অংশের নাম সৌরমুকুট বা করোনা। এই গ্যাসীয় স্তর সূর্যদেহ হইতে ঊর্ধ্বদেশে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সম্ভবত বহির্দিকে সূর্যের ব্যাস-পরিমাণ কিংবা ততোধিক স্থান ব্যাপিয়া ইহা আকাশে বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়েই করোনা সহজে ধরা পড়ে। তখন সূর্য সম্পূর্ণ আবৃত হইবামাত্র তাহার পার্শ্ব হইতে চতুর্দিকে হঠাৎ একটা শ্বেতবর্ণ জ্যোতি নিষ্ক্রান্ত হয় এবং সমুদয় দৃশ্যটিকে অপূর্ব শোভামণ্ডিত করিয়া তোলে। এই শ্বেতবর্ণ আলোই করোনার অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী

জ্যোতির্বিজ্ঞানী লিও (Lyot) পূর্ণগ্রহণের সময় ছাড়াও দিবালোকে প্রথম করোনার আলোকচিত্র ও বর্ণালী লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

করোনার বর্ণালী সাধারণ সূর্যালোকেরই ন্যায় উজ্জ্বল ও অবিচ্ছিন্ন, তবে অতি ক্ষীণপ্রভ। এই অবিচ্ছিন্ন অংশের গায়ে কয়েকটি অনুজ্জ্বল বর্ণরেখা দেখা যায়। করোনার আলো অধিকাংশই বিচ্ছুরিত সূর্যালোক, কিন্তু এই স্বল্প-উজ্জ্বল বর্ণরেখাগুলি কোন্ পদার্থের পরমাণু হইতে নির্গত হইতেছে বহুদিন তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই কেহ কেহ ইহা দ্বারা এক নূতন মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন মনে করিয়া এই নূতন পদার্থের 'করোনিয়াম' নামকরণও করিয়াছিলেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, এই স্বল্পোজ্জ্বল রেখাগুলি অতিমাত্রায়-আয়নিত-লৌহ ও নিকেল ধাতুর পরমাণু হইতে নিষ্ক্রান্ত রশ্মিদ্বারা উৎপন্ন হইতেছে। এই পরমাণুগুলি করোনার নিম্নভাগে অবস্থিত। করোনার উপরিভাগের আলোকবিশ্লেষণে জানা যায় যে, এই আলোক অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণার ন্যায় কোনো পদার্থকণা দ্বারা বিচ্ছুরিত সূর্যালোক মাত্র। কেহ কেহ মনে করেন, এই কণাগুলি ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎকণা। করোনার উপরের অংশের আলোকচিত্র অতি চমকপ্রদ। মনে হয়, কতকগুলি কণাস্রোত পরস্পর জট পাকাইয়া নিম্নের অংশকে সম্পূর্ণ ঘিরিয়া আছে। উপরের অংশ অতি শুভ্র আর নিম্নের অংশ ঈষৎ হরিদ্রাভ। সূর্যের তাপমণ্ডল হইতে যে কিরণ বহির্গত হয় তাহাই ক্রমে বর্ণমণ্ডলের মধ্য দিয়া করোনায় পৌছায় এবং তাহার উপরের অংশে ক্ষুদ্র ধূলিকণার ন্যায় কোনো বস্তুকণাদ্বারা এই কিরণ প্রবলভাবে বিচ্ছুরিত হয়। ইহা ব্যতীত করোনার নিম্নাংশে অতিমাত্রায় আয়নিত লৌহ-পরমাণু প্রভৃতি কতকগুলি বস্তুপরমাণু হইতে রশ্মি নির্গত হইয়া করোনার আলোককে কিছু জটিলতর করিয়া তোলে। সৌরদেহের অভ্যন্তর হইতে আয়নিত লৌহ ও নিকেল পরমাণু এবং সম্ভবত ইলেকট্রন প্রবলবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক বস্তুকণাস্রোতের সৃষ্টি করে বলিয়া মনে হয়। করোনার বহির্দেশে এই স্রোতের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় বারো মাইল পর্যন্ত পরিমাপ করা হইয়াছে। কিন্তু সূর্যের

এত উর্ধ্বদেশে লৌহের ন্যায় ভারী পদার্থের পরমাণু উঠা কি করিয়া সম্ভব হয়? অন্যান্য লঘুতর পদার্থই বা সেখানে নাই কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। বস্তুত করোনা বা সৌরমুকুট জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিকট এখনও এক অতি রহস্যময় বস্তু।

সূর্যালোকের বর্ণালীতে যেসকল বর্ণরেখা আছে তাহা হইতে সূর্যের বহিরাবরণে কি কি পদার্থের পরমাণু আছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। একথা পূর্বে সবিস্তারে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই-সকল বর্ণরেখা সম্বন্ধে কতকগুলি জটিল প্রশ্ন বহুদিন রহস্যাবৃত ছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তাঁহার 'পরমাণু-আয়নন-সূত্র' আবিষ্কার করিয়া এইসকল প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। বস্তুত অধ্যাপক সাহার এই সূত্র সূর্য এবং নক্ষত্র-গবেষণায় এত ফলপ্রদ হইয়াছে যে, কোনো বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী সাহার সূত্রকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ সপ্ত-আবিষ্কারের অন্যতম আবিষ্কার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কোনো নির্দিষ্ট তাপমান ও চাপে একটি গ্যাস থাকিলে তাহার পরমাণুর কত অংশ কি মাত্রায় আয়নিত হইবে এই প্রশ্নের উত্তরই সাহার আয়নন-সূত্রের মূল কথা।

সূর্যপৃষ্ঠের আলোকচিত্রে অনেক সময় তাহার উজ্জ্বল পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে কতকগুলি কালো বিন্দু ও এই বর্ণের বিস্তৃত স্থান দেখা যায়। কোনো সময় এগুলি খুব ছোটো থাকে, আবার কখনও কখনও ইহাদের মধ্যে বেশ বড়ো কালো গর্তের মতো স্থানও দেখিতে পাওয়া যায়। এই কালো বিন্দু ও স্থানগুলিকে সৌরকলঙ্ক বলে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে কিছু আলোচনা করিব। সৌরকলঙ্কগুলির কালো রঙের কারণ এই যে, ঐ স্থানগুলি পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল। শীতল বলিয়া এগুলি কম উজ্জ্বল সুতরাং উজ্জ্বলতর পৃষ্ঠতলের তুলনায় স্থানগুলিকে কালো বলিয়া মনে হয়। সৌরকলঙ্কের আলোর বর্ণরেখা ও সূর্যপৃষ্ঠের উজ্জ্বলতর স্থানের আলোর বর্ণরেখার মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। কতকগুলি পরমাণুর বর্ণরেখা সৌরকলঙ্কে বেশি কালো

কতকগুলি বর্ণরেখা সূর্যপৃষ্ঠতলে বেশি কালো কিন্তু সৌরকলঙ্কে অতিক্ষীণ বা সম্পূর্ণ অদৃশ্য, কতকগুলি বর্ণরেখা আবার উভয়স্থানে প্রায় একই প্রকার। বর্ণমণ্ডলের গ্যাস নিম্নের উলটানি স্তরের গ্যাস অপেক্ষা শীতল সুতরাং বর্ণমণ্ডলের বর্ণরেখাগুলি শীতলতর সৌরকলঙ্কের বর্ণরেখারই অনুরূপ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক বর্ণরেখা সৌরকলঙ্কে ক্ষীণ হইলেও বর্ণমণ্ডলে ইহারা অধিক প্রবল। যথা মোটা গাঢ় রঙের আয়নিত-ক্যালসিয়ামের রেখাগুলি বিশেষ করিয়া বর্ণমণ্ডলে প্রবল। বর্ণমণ্ডলের অতি উচ্চস্তরেও এই পরমাণুর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মনে করা হইত তাপের তারতম্যের জন্যই বর্ণরেখা ক্ষীণ ও প্রবল হয়। কিন্তু তাহা হইলে কতকগুলি পরমাণুর বর্ণরেখা উজ্জ্বল সূর্যপৃষ্ঠ অপেক্ষা সৌরকলঙ্কে অধিক প্রবল ও কতকগুলির আবার ইহার বিপরীত হওয়ার কারণ বুঝা যায় না। সাহার সূত্র আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে সমস্ত বিষয়টি সম্পূর্ণ একটি শৃঙ্খলাহীন অবস্থায় ছিল। কোনো অবস্থারই কোনো কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। অধ্যাপক সাহা প্রথম গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, পরমাণুর আয়নিত অবস্থার কারণ কেবলমাত্র তাপই নহে। পরমাণুটি যে গ্যাসে ভাসিতেছে তাহার চাপও অনুরূপ একটি কারণ। জলকে তাপ দিয়া বাষ্পাকারে পরিণত করার সহিত সমুদয় বিষয়টিকে তুলনা করা যাইতে পারে। সাধারণ অবস্থায় ১০০ ডিগ্রি উত্তাপ দিলে জল ফুটিয়া বাষ্প হয়, অর্থাৎ জলকণাগুলি তরল অবস্থা ত্যাগ করিয়া গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উঁচু পাহাড়ের উপর জল ১০০ ডিগ্রি অপেক্ষা কম তাপেই ফুটিতে থাকে, কারণ সেখানে জলের উপর বায়ুর চাপ কম। অধিক তাপের ন্যায় স্বল্প চাপও জলকণার বাষ্পাকারধারণের সহায়ক। অধিক তাপে যেমন পরমাণু আয়নিত হয় সেইরূপ চাপ কমিলেও পরমাণু আয়নিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বর্ণমণ্ডলের তাপ অনধিক হইলেও সেখানে চাপও এত কম যে, এই দুই কারণের সংযোগে বর্ণমণ্ডলে ক্যালসিয়াম-পরমাণু অধিক পরিমাণে আয়নিত

অবস্থাতেই থাকে। সুতরাং সেস্থানে আয়নিত ক্যালসিয়ামের বর্ণরেখাও অধিকতর প্রবল হয়। সাহার সূত্রদ্বারা পূর্বের শৃঙ্খলাহীন পর্যবেক্ষণ-ফলগুলিকে সুন্দরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা গিয়াছে, এবং সূর্য ও তারকার বহিরাবরণের বহু জটিল সমস্যার সুন্দর মীমাংসা হইয়াছে। বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানক্ষেত্রে পরমাণু-আয়নন-সূত্র ব্যতিরেকে চলা অসম্ভব।

খ্রীস্টের জন্মের দুই-তিন হাজার বৎসর পূর্বে চীনদেশের বিজ্ঞানীরা সৌরকলঙ্ক পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দূরবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ইয়োরোপে গ্যালিলিওই প্রথম সৌরকলঙ্ক পর্যবেক্ষণ করেন। ধর্মযাজকদের প্রভাবে তখন এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, সূর্য অতি পবিত্র বস্তু। তাহাতে কলঙ্ক আরোপ করায় তখন চারিদিক হইতে লোকে গ্যালিলিওকে ধিক্কার দিতে থাকে। জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী শাইনার লক্ষ্য করেন যে, সূর্যের গায়ের কালো বিন্দুগুলি পূর্ব দিক হইতে আস্তে আস্তে কিছুকাল পরে পশ্চিম দিকে চলে। কখনও কখনও পশ্চিম সীমান্তের বিন্দুগুলি অন্তর্হিত হইয়া কিছুকাল পরে পুনরায় পূর্ব সীমান্তে দেখা দেয়। শাইনার ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্য পৃথিবীর ন্যায় পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঘোরে। পৃথিবী তাহার কক্ষপথে সূর্যকে যে দিক হইতে প্রদক্ষিণ করে সূর্যও সেই দিকে নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘোরে। মোটামুটি ২৭ দিনে একগুচ্ছ কলঙ্ক-বিন্দুকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়া পূর্বস্থানে আসিতে দেখা যায়। এই আবর্তনের দিকে পৃথিবীর গতি বাদ দিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় সূর্যের আবর্তনকাল মোটামুটি ২৫ দিন। কিন্তু সূর্যের আবর্তন পৃথিবীর ন্যায় কঠিন পদার্থের আবর্তনের মতো নহে। সূর্যদেহ গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত। তাহার মধ্যস্থল বা বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্থানের আবর্তন-বেগ অপেক্ষাকৃত উপর কিংবা নীচু অংশের আবর্তনবেগ অপেক্ষা বেশি। বিষুবরেখা হইতে ক্রমশ উত্তর ও দক্ষিণে দূরের কলঙ্ক-বিন্দুগুলির আবর্তনকালও ক্রমাগত বেশি হইতে দেখা যায়।

সৌরকলঙ্কগুলির আকৃতি ও গতি বিভিন্ন প্রকারের; অনেকগুলি

কলঙ্ক বিন্দুর মতো ছোটো। কিন্তু সাধারণত এইরূপ বহু নিকটবর্তী কালো বিন্দু একটি কলঙ্কগুচ্ছ রচনা করে। কলঙ্কগুচ্ছই পর্যবেক্ষণের পক্ষে সুবিধাজনক। এক-একটি কলঙ্ক কখনও এত বড়ো হয় যে, খালি-চোখেও তাহাকে দেখা যায়। বড়ো একটি কলঙ্কের মধ্যস্থল খুব কালো। বাহিরের দিকে এই রং ক্রমশ হালকা হইয়া কলঙ্কের সীমানায় ইহা সম্পূর্ণ উজ্জ্বল হয়। এই মধ্যস্থল ও বাহিরের অংশকে ঘনছায়া (Umbra) ও ঈষচ্ছায়া (Penumbra) বলা হয়। বড়ো কলঙ্কগুচ্ছে কখনও কখনও কয়েকটি কলঙ্কের ঘনছায়া একটিমাত্র বৃহৎ ঈষচ্ছায়া-দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। আলোকচিত্রে বড়ো বড়ো কলঙ্কগুলিকে কালো গর্তের মতো দেখায় এবং ঈষচ্ছায়ার অংশগুলিকে গর্তের ঢালু পার্শ্ব বলিয়া মনে হয়। সৌরকলঙ্কগুলির ঘনছায়ার ব্যাস পাঁচ হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার মাইল পর্যন্ত হইতে দেখা যায়। ঈষচ্ছায়া-অংশ ঘনছায়া-অংশের কয়েকগুণ পর্যন্তও হয়। সুতরাং বড়ো বড়ো কলঙ্কগুলিতে কুড়ি হইতে চল্লিশটি পৃথিবীর স্থান হইতে পারে। কলঙ্কগুলির কালো রং এই সকল স্থানে আলোর অভাবের জন্য নহে। পার্শ্ববর্তী উজ্জ্বল স্থানের সহিত তুলনায় মাত্র তাহাদের কালো বলিয়া মনে হয়। বুধ ও শুক্রগ্রহ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী স্থান দিয়া যায় তখন সূর্যপৃষ্ঠে তাহাদের যে বিন্দুর মতো ছায়া পড়িতে দেখা যায় সেই ছায়ার তুলনায় সৌরকলঙ্কগুলিকে অনেক বেশি উজ্জ্বল মনে হয়। সৌরকলঙ্কগুলি যদি তাপমণ্ডলের গায়ে না থাকিয়া পৃথিবীর উপর থাকিত তাহা হইলে তাহাদের ঘনছায়া-অংশগুলিকেও কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট আমাদের উষ্ণতম চুল্লী অপেক্ষাও অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখাইত।

সূর্যপৃষ্ঠের সকল স্থানে সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব হয় না। মোটামুটি বিষুবরেখা হইতে ৩০ ডিগ্রি উত্তর পর্যন্ত এবং দক্ষিণেও প্রায় এই অক্ষাংশ-পর্যন্ত বেশির ভাগ সৌরকলঙ্কগুলিকে থাকিতে দেখা যায়। ঠিক বিষুবরেখা অঞ্চলে এবং তাহার তিন-চার ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণে কদাচিৎ তাহাদের আবির্ভাব হয়।

সৌরকলঙ্কগুলিকে সূর্যপৃষ্ঠের স্থায়ী চিহ্ন বলা চলে না। অধিক-

সংখ্যক ক্ষুদ্র কলঙ্ক সূর্যপৃষ্ঠে আবির্ভাবের তিন-চার দিনের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। কলঙ্কগুচ্ছগুলির প্রায় পনরআনাই সূর্যের এক পূর্ণ-আবর্তনকালের মধ্যে অদৃশ্য হয়। অতি অল্পসংখ্যক গুচ্ছকেই এক হইতে তিন মাস কাল স্থায়ী হইতে দেখা যায়। এযাবৎ একটিমাত্র কলঙ্ককে ১৮ মাস থাকিতে দেখা গিয়াছে।

কলঙ্কগুলি সূর্যদেহের ভিতরে তাহার কোনোপ্রকার ক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হয়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, যথা একমাস কালের মধ্যে যতগুলি সৌরকলঙ্ক দেখা যায়, এই সংখ্যাটিকে সূর্যের ক্রিয়াশীলতার একটি পরিমাপ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই সংখ্যাটি প্রতিমাসে সমান থাকে না সুতরাং সূর্যের ক্রিয়াশীলতা পরিবর্তনশীল। তাই বলিয়া ইহা একেবারে নিয়মহীন নহে। বহু পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে যে, গড়ে প্রতি ১১ বৎসরে সূর্যের ক্রিয়াশীলতার পুনরাবর্তন ঘটে অর্থাৎ একই প্রকার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। ইতিমধ্যে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা একবার সর্বাধিক ও একবার সর্বনিম্ন হয়। সংবৎসরকালে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা গণনা করিয়া ক্রিয়াশীলতা পরিমাপ করিলে ১১ বৎসর আবর্তনকালটি স্পষ্ট ধরা যায়। কম সময় ধরিয়া গণনা করিলে ঘটনাপরম্পরার অনেক তারতম্য লক্ষিত হয়। গত ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে এই ক্রিয়াশীলতা একবার সর্বাধিক হইয়াছিল। কোনো কোনো সর্বাধিক ক্রিয়াশীলতার সময়ে ১০০টি কলঙ্ককেও এক-কালে দেখা যায়, আবার ক্রিয়াশীলতা সর্বনিম্ন হইলে কয়েক সপ্তাহ, এমনকি মাসাবধিকালও, কোনো সৌরকলঙ্ক দৃষ্টিগোচর হয় না।

সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব ও লয়ের মধ্যে কতকগুলি সুন্দর নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত একটি স্থান বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং তাহার পার্শ্বে কয়েকটি কালো বিন্দু দেখা দেয়। কয়েকদিনের মধ্যেই বিন্দুগুলি ক্রমশ জমাট বাঁধিতে থাকে এবং শীঘ্রই সমুদয় বিন্দুগুচ্ছটিতে দুইটি বড়ো কলঙ্ক দেখা দেয়। ইহাদের একটি অন্যটির কয়েক ডিগ্রি পশ্চিমে থাকে। পশ্চিম দিকেরটিকে বলা হয় 'চালক' (leader) অপরটিকে 'অনুচর' (follower) কারণ, দুইটিই এক-

সঙ্গে পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে চলিতে থাকে। এই চলার দিকেই সূর্য-পৃষ্ঠেরও আবর্তন লক্ষ্য করা যায়। চলিবার কালে চালক ও অনুচরের পরস্পর দূরত্ব দুই-তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলঙ্ক সময় সময় চালক ও অনুচরকে ঘিরিয়া থাকে। সূর্যের ক্রিয়াশীলতা যখন কমিতে থাকে তখন প্রথমত অনুচরটি খণ্ডখণ্ড হইয়া ভাঙিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। চালকটি ততক্ষণে পার্শ্বের ছোটো ছোটো বিন্দুগুলিকে হারাইয়া নিঃসঙ্গ অবস্থায় কিছুকাল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার পর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী এভারসেড লক্ষ্য করেন যে সৌরকলঙ্ক যখন সূর্যপৃষ্ঠের প্রান্তে অবস্থিত থাকে তখন তাহার চতুষ্পার্শ্বের পদার্থের একটি গতি লক্ষ্য করা যায়। সেই সময়ে কলঙ্কের ঈষচ্ছায়া-প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের দিকে চারিদিকে একটি গ্যাসের স্রোতপ্রবাহ দেখা যায়। সৌরপদার্থের এই গতি এই সকলস্থানের বর্ণরেখার 'ডপ্‌লার ফল' দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়। কলঙ্কটির যে পার্শ্ব সূর্যপৃষ্ঠের কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত গ্যাসের বহির্মুখী স্রোতের জন্য ঐ দিকের গ্যাস অংশত পর্যবেক্ষকের দিকে প্রবহমান এবং সূর্যপৃষ্ঠের প্রান্তের দিকের গ্যাসের সেই কারণেই ইহার বিপরীতদিকে গতি লক্ষিত হয়। সুতরাং প্রথমক্ষেত্রে ঐ স্থানের বর্ণরেখাগুলির বেগনি ও দ্বিতীয়ক্ষেত্রে অপর পার্শ্বের বর্ণরেখাগুলির লাল রঙের বর্ণালীর দিকে স্থানান্তর ঘটে। ঠিক এইরূপ ঘটনাই এভারসেড প্রথম পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ঐ বর্ণরেখা হইতে জানা যায় যে, ঐ গ্যাস-স্রোত তাপমণ্ডলের উপরিভাগ ও উলটানি স্তরে অবস্থিত। ইহা মোটেই কল্পনাপ্রসূত নহে, কারণ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি কিরূপে বর্ণরেখার কালো রঙের সূক্ষ্ম পরিমাপ করিয়া কোন্ স্তরের গ্যাসে ঐ বর্ণরেখার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা গণনা করিয়া বলা যায়। পরবর্তী-কালে এভারসেড আরও লক্ষ্য করেন যে, তাপমণ্ডলের বহু উচ্চে বর্ণমণ্ডলেও ঐরূপ একটি গ্যাসীয় স্রোতকে বিপরীত দিকে অর্থাৎ বাহিরের দিক হইতে কলঙ্কের ঈষচ্ছায়ার দিকে প্রবহমান দেখা

যায়। গ্যাসপ্রবাহ হইতে মনে হয়, সৌরকলঙ্ক একটি গ্যাসের আবর্ত। চোঙার মতো ইহার দেহ এবং এই চোঙার মধ্য দিয়া সূর্যের ভিতরদিক হইতে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ গ্যাস উপরে উঠিয়া শীতল হয় এবং পরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, ঠিক যেমন শীতের দেশে ঘরের চুল্লীতে আগুন জ্বালিলে ঘরের বায়ু প্রথমত চুল্লীতে প্রবেশ করে এবং এই উত্তপ্ত বায়ু ও ধোঁয়া চিমনি দিয়া উঠিয়া উপরে বাতাসের সহিত মিশিয়া যায়। এ অনুমান সত্য হইলে সৌরকলঙ্ক যখন সূর্যপৃষ্ঠের মধ্যস্থলে, অর্থাৎ আমাদের ঠিক সম্মুখে থাকে তখন আবর্তের চিমনি হইতে নির্গত গ্যাস সম্মুখের দিকে প্রবাহিত হইবে। সেই সময়ে ঘনছায়া অংশের আলোকচিত্রে ঐ স্থানের গ্যাসের সম্মুখের দিকের গতি ধরা পড়িবার কথা। কিন্তু পর্যবেক্ষণ দ্বারা এইরূপ গতির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ মনে করেন, চোঙার অর্থাৎ আবর্তের নিম্নভাগটি তাপমণ্ডলের বহু নিম্নে অবস্থিত। সেখানকার গ্যাস অনেক বেশি ঘন এবং তথাকার সামান্য একটু সম্মুখের দিকের গতিতে উপরের হালকা গ্যাসে জোর বহির্মুখী গতির সৃষ্টি হয়। বর্ণমণ্ডলের বিপরীতমুখী গতি প্রকৃতপক্ষে যদিও নীচের গতিরই ফল কিন্তু এই শেষোক্ত গতির সঠিক কারণ এখনও অজ্ঞাত। কিছুকাল পূর্বে উন্‌সোল্ড নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী গণিতের সাহায্যে উপরের পরিকল্পনা আরও বলবত্তর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাপমণ্ডলের ১০০ হইতে ১৫০ মাইল গভীর স্তরগুলিতে যে উত্তাপ আছে তাহাতে পরমাণু-আয়নন সহসা বৃদ্ধি পায়, তাহার ফলে ঐ স্থানে একটি নীচ-উপর ও তাহার বিপরীত উপর-নীচ দিকে গ্যাসস্রোতের সৃষ্টি হয়। অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত গ্যাস প্রথমত নীচ হইতে উপর দিকে উঠে। উঠিতে উঠিতে শীতল হইয়া পড়ে এবং পরে ইহা হইতে একটি নিম্নগামী প্রবাহের উৎপত্তি হয়। সৌরকলঙ্কের প্রকৃত রূপ এবং তাহার উৎপত্তি ও লয়ের সঠিক কারণ বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত, কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করেন উন্‌সোল্ড কর্তৃক আবিষ্কৃত স্রোতের সহিত সৌরকলঙ্কের জীবনরহস্যের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে।
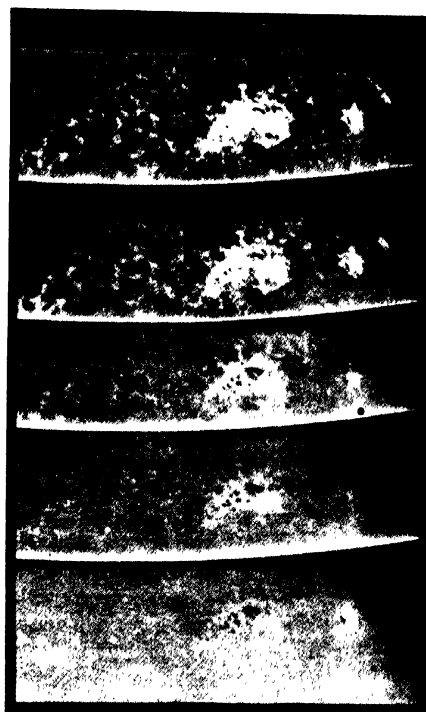
চিত্র ১৬— সূর্যের বায়ুমণ্ডলের পাঁচটি স্তর। উপর হইতে নীচে পর পর এইভাবে এই বায়ুমণ্ডল সূর্যকে ঘিরিয়া আছে। বর্ণরেখা হইতে স্তরের গভীরতা নির্ণয় করা হয়। ক্যালসিয়াম-রশ্মিদ্বারা গৃহীত ইহা একটি একবর্ণ আলোকচিত্র

চিত্র ১৭ — সূর্যপৃষ্ঠ। চারটি সৌরকলঙ্কচিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এই চিত্র একবর্ণীয় রশ্মিদ্বারা গৃহীত

অন্ত-একটি অপ্রত্যাশিত কারণেও সৌরকলঙ্ক আমাদের নিকট এক পরম কৌতূহলজনক বস্তু। আমেরিকার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেল্ (Hale) ও ফরাসী বিজ্ঞানী দেলাঁদ্র (Deslandres) এক অভিনব উপায়ে সূর্যের আলোকচিত্র লইবার প্রথা আবিষ্কার করেন। তাঁহারা দেখান্ যে সূর্যের বর্ণালীর হাইড্রোজেন বা ক্যালসিয়াম বর্ণরেখায় যে আলো আছে সেই আলোটুকুমাত্র সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে আলোকচিত্র লইলে সূর্যপৃষ্ঠের এক অভিনব রূপ দেখা যায়। এই আলোতে প্রকৃতপক্ষে বর্ণমণ্ডলেরই ছবি পাওয়া যায়, কারণ ঐ দুইটি রেখা বিশেষ করিয়া বর্ণমণ্ডলেই সৃষ্ট হয়। এইরূপ চিত্রকে একবর্ণীয় সৌরচিত্র (Spectro-heliogram) বলা যাইতে পারে। এইরূপ একটি চিত্রে (চিত্র ১৭) চারটি সৌরকলঙ্কের ছবি দেখান হইল; চিত্রটির গায়ে শাদা ও কালো ডোরা দাগ আছে। সৌরকলঙ্কগুলিকে ক্ষুদ্র বৃত্তের ন্যায় দেখাইতেছে। বৃত্ত হইতে কালো কালো দাগ আঁকিয়া বাঁকিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। চিত্রটি দেখিলেই একটি চুম্বকের কথা মনে পড়ে। একটি লম্বামতো চুম্বককে কাগজের উপর রাখিয়া উপর হইতে আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র লোহকণা ছড়াইলে চুম্বকের আকর্ষণে কণাগুলি যে ভাবে কাগজের উপর সাজান অবস্থায় থাকে তাহাও দেখানো হইল—
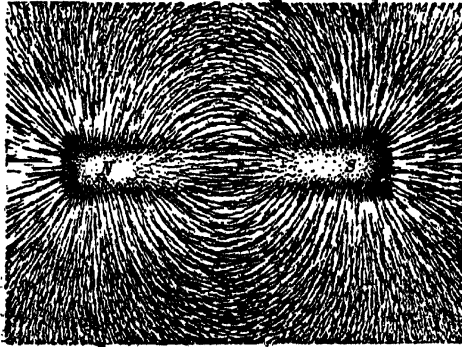
চিত্র ১৮ — চুম্বকের উপর লোহকণা ছড়াইলে কণাগুলি এইরূপ সাজানো অবস্থায় থাকে

১৭ ও ১৮ চিত্র দুইটির মধ্যে প্রবল সাদৃশ্য আছে। একটি সৌর-কলঙ্কের মধ্যে ইলেকট্রনের মত তড়িৎকণা যদি বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে তবে তড়িৎ-চুম্বকীয় নিয়মানুসারে কলঙ্কটি চুম্বকধর্মী হইবে। এই চুম্বকধর্ম সোজাসুজি প্রমাণ করা কঠিন। হেল্ ইহার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করেন। বহুপূর্বে হল্যাণ্ডদেশীয় বিজ্ঞানী ৎসিমান্ (Zeeman) প্রমাণ করিয়াছিলেন যে একটি পরমাণু যদি শক্তিমান চুম্বকের নিকট থাকে তবে ঐ পরমাণুজাত এক-একটি বর্ণরেখা বিভক্ত হইয়া দুই বা ততোধিক বর্ণরেখায় পরিণত হয়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া হেল্ সৌরকলঙ্কের ও উজ্জ্বল সূর্যপৃষ্ঠের একই বর্ণরেখার সূক্ষ্মভাবে তুলনা করিয়া প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, সৌরকলঙ্কের বহু রেখা প্রকৃতপক্ষে ৎসিমান্-ফলানুযায়ী বিভক্ত। সুতরাং কলঙ্কগুলিকে চুম্বকধর্মী বলিতে হইবে। ৎসিমান্-ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া চুম্বকের মেরুত্বও নির্ণয় করা সম্ভব। এইরূপে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে নির্ণীত হয় যে, প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই কলঙ্কগুচ্ছের পরিচালকের চৌম্বকমেরু পৃথিবীর দক্ষিণ চৌম্বকমেরুর অনুরূপ এবং অনুচরের চৌম্বকমেরু তাহার বিপরীত। ইহাই হইল সূর্যের উত্তর-গোলার্ধের কলঙ্কের চুম্বকধর্ম। দক্ষিণ-গোলার্ধের কলঙ্কের চুম্বকধর্ম ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের কিছুকাল পর সূর্যের সর্বনিম্ন ক্রিয়াশীলতার কাল উত্তীর্ণ হইলে যখন ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় কলঙ্ক-গুচ্ছগুলি দেখা দিল তখন দেখা গেল যে, তাহাদের চৌম্বকীয় মেরু ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ পরিচালকটি উত্তর ও অনুচরটি দক্ষিণমেরুধর্মী। এই চুম্বকধর্মের অবস্থান্তর ১৯২২ ও ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে সূর্যের সর্বনিম্ন ক্রিয়াশীলতার পর প্রতিবারই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। সুতরাং কলঙ্কের একাদশবর্ষীয় কাল পূর্ণ হইলে তাহাদের চৌম্বকীয় মেরুত্ব যে সম্পূর্ণ বিপরীত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্বনিম্ন ক্রিয়াশীলতার পরই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বলিয়া সর্বনিম্ন ক্রিয়াশীলতার পর হইতেই একাদশবর্ষীয় কালের আরম্ভ গণনা করা উচিত। কিন্তু এই চুম্বকধর্মের প্রকৃত কারণ কি, পরিবর্তনেরই বা কি হেতু তাহা এখনও রহস্যাবৃত।

সৌরকলঙ্কের চুম্বকধর্মের সহিত পৃথিবীর কোনো-কোনো ঘটনার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। একবর্ণীয় সৌরচিত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু উজ্জ্বল স্থান দেখা যায়। এইগুলি বর্ণমণ্ডলের উত্তপ্ত গ্যাসের বুদ্বুদ বিশেষ। মনে হয় এইসব স্থানে গ্যাস যেন তরল পদার্থের ন্যায় টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। আমরা ইহাদিগকে 'সৌরবুদ্বুদ' (flocculi) বলিব। সৌরবুদ্বুদ ও সৌরস্ফীতিকে একই জাতীয় বস্তু বলা যাইতে পারে। সৌরকলঙ্কের চতুষ্পার্শ্বেও কতকটা স্থান ব্যাপিয়া এইরূপ উজ্জ্বল গ্যাস-পুঞ্জকে সর্বদা দেখা যায়। সাধারণত সৌরবুদ্বুদগুলি ক্ষণস্থায়ী। দেখা যাইবার কয়েকমিনিটের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া কিছুকাল ঐ অবস্থায় থাকিবার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইহারা আবার মিলাইয়া যায়। কলঙ্কের পার্শ্বের উজ্জ্বল স্থানগুলির পরিবর্তন এত শীঘ্র হয় না। কিন্তু কলঙ্কের অতি নিকেটই ক্রিয়াশীল-বুদ্বুদগুলিকে দেখা যায়। পর্য-বেক্ষণের ফলে জানা গিয়াছে যে, এই বুদ্বুদের সহিত পৃথিবীর চুম্বক-ধর্মের পরিবর্তনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রেডিও-বার্তা শুনিবার কালে অনেক সময় রেডিও-যন্ত্রটি নিঃশব্দ হইয়া যায়। সমুদ্রবক্ষে নাবিকরাও সচরাচর লক্ষ্য করেন যে, সময় সময় তাঁহাদের কম্পাসের কাঁটাগুলি অযথা বিচলিত হইতে থাকে। পৃথিবীর চুম্বকধর্মের সহসা পরিবর্তনে এইসকল ঘটনা ঘটে। বিজ্ঞানীরা ইহাকে বলেন 'চৌম্বক-ঝড়'। এখন জানা গিয়াছে যে, সৌরবুদ্বুদের ক্রিয়াশীলতার সহিত এই চৌম্বক-ঝড়ের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ডেলিঙ্গার নামে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ হইতে এ বিষয়ে অনেক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহার মতে সৌরবুদ্বুদগুলি ক্রিয়াশীল হইবার সঙ্গেসঙ্গেই পৃথিবীতে চৌম্বক-ঝড় আরম্ভ হয়। সম্ভবত সূর্যের ক্রিয়া-শীলতার ফল আলোক-তরঙ্গের (তড়িৎ-চুম্বকীয়-তরঙ্গের) বেগে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। সূর্য ও পৃথিবীর ঘটনার মধ্যে এইরূপে যোগাযোগ স্থাপিত হইতেছে। কার্যকারণ-সম্বন্ধদ্বারা এই দুই স্থানের ঘটনাগুলি একসূত্রে গ্রথিত।

হেল্ কর্তৃক সৌরকলঙ্কের চুম্বকধর্মের আবিষ্কারের পর

বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, পৃথিবী যেমন একটি বৃহৎ চুম্বকের ধর্ম ধারণ করে এবং তাহার চতুর্দিকে একটি চুম্বকক্ষেত্র* বর্তমান, সেইরূপ হয়তো সমুদয় সূর্যেরও একটি চুম্বক-ক্ষেত্র আছে। এ বিষয়ে ৩০ বৎসর যাবৎ মাউণ্ট উইলসনের মানমন্দিরে পরীক্ষা চলিতেছে। এই পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, সূর্যও পৃথিবীর ন্যায় একটি বৃহৎ চুম্বক বিশেষ এবং তাহার 'মেরুত্ব' পৃথিবীরই অনুরূপ। এ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ না থাকিলেও বিভিন্ন কালের পর্যবেক্ষণ-ফলের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাবহেতু কোনো স্থির সিদ্ধান্তে এখনও পৌছানো সম্ভব হয় নাই।

প্রাচীনকাল হইতে মানুষ সূর্যের পূজা করিয়া আসিয়াছে। বর্তমানযুগেও সূর্যকে মানুষ জীবের প্রাণপোষণকারী ও সবতেজের আকর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। সূর্য আকাশে আমাদের নিকটতম জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ। কিন্তু তাহার বহিরাবরণ সম্বন্ধেও আমরা এখনও বিশেষ-কিছু জানিতে পারি নাই। পর্যবেক্ষণ দ্বারা যাহা-কিছু জানা গিয়াছে তাহা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অসংলগ্ন ঘটনা-বিশেষ। কার্যকারণ-সম্বন্ধদ্বারা ঘটনাগুলি এখনও একসূত্রে গ্রথিত হয় নাই। জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নিকট সৌরদেহের প্রায় সকল কথাই এক-একটি সমস্যা। প্রকৃতির এই বিরাট কর্মশালার সম্মুখীন হইয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানী কতকগুলি ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া অভ্যন্তরের বিপুল অগ্নিকাণ্ডের সামান্য কিছু আভাসমাত্র সময়ে সময়ে পাইতেছেন। এই কর্মশালার গোপন রহস্য একদিন তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইবে এই তাঁহার আশা।

---

* বিজ্ঞানীরা মনে করেন কোনো এক স্থানে একটি চুম্বক রাখিলে তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলির সকল 'বিন্দুই একটি বিশেষ 'চুম্বকধর্ম' প্রাপ্ত হয়। এইরূপ কোনো একটি বিন্দুতে একটি ক্ষুদ্র চুম্বক-কম্পাস রাখিলে কম্পাসের কাঁটাটি একটি বিশেষ দিক নির্দেশ করিবে এবং কাঁটার উপর চুম্বকের আকর্ষণও নির্দিষ্ট পরিমাণ হইবে। এই পরিমাণ আকর্ষণ ও তাহার (কাঁটার) দিকটি ঐ বিন্দুর চুম্বকধর্মের চিহ্ন। এইরূপস্থলে বিজ্ঞানীরা বলেন কোনো চুম্বক তাহার চতুষ্পার্শ্বে একটি 'চুম্বকক্ষেত্র' সৃষ্টি করে।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	৪ ও ৬	Doplar	Doppler
৩২	১৫	দক্ষিণাবর্ত্তে	বামাবর্ত্তে
৩৪	৪	বৃহৎ গ্রহ	বৃহৎ গ্রহ ও প্লুটো
৩৬	২২	আকাশে আলোকের	আকাশের আলোকের
৩৭	শেষ	গ্রহের মধ্যে	কক্ষের মধ্যে
৪৭	১৬	হারমিগ	হারমিস্
৪৯	২৩	২০০ ডিগ্রি	—২২০ ডিগ্রি
৫০	১৯	২৯½ দিন	২৯½ বৎসর
৫১	৬	অনুরূপ	অপরূপ
৫২	৯	শনিপৃষ্ঠে	শনিপৃষ্ঠকে
৫৩	১৫	৩০০ ডিগ্রি	—২৪০ ডিগ্রি
৫৪	৭	কিন্তু আকারে	এবং আকারে
৫৭	১৩	ভার	ভর
৫৮	৮	দক্ষিণাবর্ত	বামাবর্ত
	১৩	বামাবর্ত্তে	দক্ষিণাবর্ত্তে
	১৪	দক্ষিণাবর্ত্তে	বামাবর্ত্তে
৬১	২৬	চালনা করিতে	দান করিতে
৬	১৯	উপরক্তি	উপরোক্ত

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

১৩৫২ । ৩৭. হিন্দু সংগীত : প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. সুখের ইতিকথা : সুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৫৩ । ৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫৭. ভারতের বনৌষধি : ডক্টর শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮. উপনিষদ্ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯. শিশুর মন : ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী
৬০. প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা : ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

১৩৫৪ । ৬১. ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬২. ভারতশিল্পের মূর্তি : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৩. বাংলার নদনদী : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪. ভারতের অধ্যাত্মবাদ : ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫. টাকার বাজার : শ্রীঅতুল সুর
৬৬. হিন্দুসংস্কৃতির স্বরূপ : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

১৩৫৫ । ৬৭. শিক্ষাপ্রকল্প : শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
৬৮. ভারতের রাসায়নিক শিল্প : ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
৬৯. দামোদর পরিকল্পনা : ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০. সাহিত্য-মীমাংসা : শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
৭১. দূরেক্ষণ : শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২. তেল আর ঘি : শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়